সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০১৭

বৃষ্টি যখন নামল...

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার কর্মব্যস্ততা...

০১. ১ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা প্রধানত শ্রীনগর, জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে স্বাগত জানান। এসময় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জে এস নন্দা উপস্থিত ছিলেন

০২. ৫ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পবিত্র জন্মভূমি পাবনায় বিহারের দেওঘর সৎসংঘের প্রতিনিধিদের আলোচনা

০৩. ৫ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা হাই কমিশনে সাক্ষাৎকালে ভান্তে সুমনানন্দ ভিক্ষুকে ধন্যবাদ জানান

০৪.
০৬ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

০৫.
৭ জুন ২০১৭ ঢাকায় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপির সঙ্গে তাঁর অফিসে ভারতের অংশীদারিত্বে চলমান প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন

০৬.
৭ জুন ২০১৭ মেয়াদশেষে ঢাকা ত্যাগকারী আমাদের সহকর্মীদের বিদায় এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে নতুন যোগদানকারী নতুন বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ভারতীয় হাই কমিশন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০৭ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৪ | জুলাই ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য
যোগব্যায়ামেরই একটি রূপ
পৃষ্ঠা: ৪৬

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ০৪
শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন
ব্যবহার উপযোগী ভারতীয় ভিসা ০৫

প্রবন্ধ — যখন বৃষ্টি নামল... ॥ কল্যাণী প্রসার ০৮
ঐতিহ্যের ধামাইল গানে রাধারমণ ॥ বিশ্বজিৎ রায় ১২
ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য যোগব্যায়ামেরই একটি রূপ
মহুয়া মুখোপাধ্যায় ৪৬

ছোটগল্প — জীবনের জমাখরচ এবং যৌবন ॥ সালেহা চৌধুরী ১৫
আশীর্বাণী ॥ কৌস্তুভ বসু ৩০

অনুবাদ গল্প — বনফুল ॥ অমৃতা প্রীতম ২১

ভ্রমণ — গান্ধীজীর দেশে আমরা ॥ নওশাদ জামিল ১৮

কবিতা — মথুরানাথ কুণ্ডু ॥ নৃপেন চক্রবর্তী
রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী ॥ কাজল চক্রবর্তী ২৪
দুলাল সরকার ॥ বিশ্বজিৎ মণ্ডল
পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ॥ শুভ্রনীল সাগর ২৫

স্মরণ — জন্মশতবর্ষে কানন দেবী ॥ তপন চক্রবর্তী ২৬

উচ্চশিক্ষা — বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য
ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ ৩৫

ধারাবাহিক — তর্পণ ॥ ঋতা বসু ৩৬

রাজ্য পরিচিতি — বিহার ৪০

রান্নাঘর — বিহারের রান্না ৪৫

১৮ থেকে ২০

গান্ধীজীর দেশে আমরা

কতকিছু দেখব, ভ্রমণ করব কত জায়গায়–সবার মধ্যেই ছিল টানটান উত্তেজনা। আবেগ ছিল যত, তারচেয়ে বেশি ছিল নতুন কিছু দেখার, শেখার রোমাঞ্চকর বাসনা। দুইচারজন নই; আমরা ৫০ জন তরুণ, ৫০ জন তরুণী– শুভেচ্ছা সফরে যাচ্ছি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতে। বিশাল এক দেশ ভারত, যেন মহাদেশ। আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনই সমৃদ্ধ তার সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতার নানা নিদর্শন যেমন আছে দেশটির নানা জায়গায়, তেমনই ছড়িয়ে প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন। ঘুরেফিরে আমরা দেখব দেশটির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নানা স্থাপনা, সৌজন্য সাক্ষাৎ করব ভারতের মহামান্য রাষ্টপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

অন্য কোথাও পাইনি

আমি আপনাদের ভারতীয় হাই কমিশনের সৌজন্যমূলক ম্যাগাজিন *ভারত বিচিত্রা* পেয়ে ভীষণভাবে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। ম্যাগাজিনটি আমার ভীষণ ভাল লেগেছে, অনেক কিছু জানতে পারলাম এখান থেকে, যা অন্য কোথাও পাইনি। আমাকে এই ম্যাগাজিনটি সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে ভারতীয় হাই কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই। আমি নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পেতে আগ্রহী। পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

এম জামাল আহমেদ সুবর্ণ
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
হেড অফিস (১ম তলা), ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
২৬ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

হার্ড কপি অচিরেই...

আমি *ভারত বিচিত্রার* একজন অনলাইন পাঠক, মূলত আমি পিডিএফ ভার্সনে ম্যাগাজিনটি পড়ি। বর্তমানে আমি আমার স্কুলের পাঠাগারে ম্যাগাজিনটির কপি সংগ্রহ করতে চাচ্ছি, তা কি আদৌ পাওয়া সম্ভব? আশা করছি ম্যাগাজিনটির হার্ড কপি অচিরেই আমার হাতে এসে পৌঁছবে।

মুহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক, এস এ চৌধুরী ইনস্টিটিউট
মছজিদ্দা, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ ও উন্নত

আপনার সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রা* একটি অত্যন্ত সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ ও উন্নত ম্যাগাজিন। যে কটি সংখ্যা পড়েছি অসাধারণ মনে হয়েছে। ভারতবর্ষকে জানতে *ভারত বিচিত্রার* অবদান অতুলনীয়। আমি নিজেও একটু-আধটু লেখালেখি করি, এজন্যে পত্রিকাটি পড়ে উপকৃত হই এবং আনন্দও পাই। অক্টোবর ২০১৬ সংখ্যায় গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার উদ্যোগ ও বিজ্ঞপ্তি দেখে আশান্বিত হলাম। আমার ঠিকানায় নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রফিকুর রহমান
শিলকাটান, ২৭/এ রাসোস, রায়নগর সোনার পাড়া
সিলেট-৩১০০

শিল্পগুণসম্পন্ন

বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমানের নামে আমরা এটি স্মৃতি সংসদ গড়ে তুলেছি। এটি গাইবান্ধা সদর উপজেলার ৬ নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রামে অবস্থিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর আমাদের ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি বেশ সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। তাই শিল্পগুণসম্পন্ন এবং সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ রচনার অগ্রনায়ক *ভারত বিচিত্রা* বিনামূল্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের আবেদন করছি।

মো. মোক্তাদির রহমান রোমান
সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান স্মৃতি সংসদ
ডাকঘর- রহমতপুর, উপজেলা- গাইবান্ধা
গাইবান্ধা-৫৭০০

পিয়নকে বিরক্ত করা

অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোয় না, কবে *ভারত বিচিত্রা* আসবে। কখনো পোস্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আবার কখনো পিয়নকে বিরক্ত করার যেন কমতি নেই। হঠাৎ পাঠাগারের দরজা খুলেই দেখা যায় চৌকাঠের ফাঁকা দিয়ে রাখা *ভারত বিচিত্রা*। পত্রিকাটি হতে পেয়ে অধীর আগ্রহের অপেক্ষায় থাকা মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় ২০১৬-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, জুন, জুলাই এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। ইতোপূর্বেও আপনার বরাবরে অনুরোধ করেছিলাম সংখ্যাগুলো পাঠানোর জন্য। আবারও অনুরোধ করছি যদি এই সংখ্যাগুলো আপনাদের সংগ্রহে থাকে তাহলে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে চিরঋণী করবেন। অন্যদিকে *ভারত বিচিত্রার* পৃষ্ঠা কেটে ইংরেজি ব্লক লেটারে ঠিকানা লিখে দ্রুত পাঠানোর কথা বলেছেন।

আমরা এমন মূল্যবান পত্রিকাটির পৃষ্ঠা না কেটে পাঠাগারের প্যাডে ঠিকানা লিখে পাঠালাম। আশা করি, আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য হবে না।

নিরঞ্জন মিত্র
সভাপতি, শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন পাঠাগার
গ্রাম+ডাকঘর- উত্তর সোনাখালী
উপজেলা- মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

মনটা আনন্দে ভরে যায়

মাস শেষ হলে গুনতে থাকি কবে পাব আমার প্রিয় ম্যাগাজিন *ভারত বিচিত্রা*। নানা কর্মব্যস্ততায় এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করি। এসে দেখি ডাক পিওন টেবিলের উপর রেখে গেছে প্রিয় ম্যাগাজিন *ভারত বিচিত্রা*। আর তা দেখে মনটা আনন্দে ভরে যায়। এইভাবে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাগাজিন পেলে মনটা আনন্দে থাকবে।

অশোক সাহা, জেনারেল সেক্রেটারি
কাননবালা পাঠাগার
থানা রোড, চরফ্যাসন পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ড
চরফ্যাসন, ভোলা

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

সম্পাদকীয়

ঋতুচক্রের বিধান অনুযায়ী আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল। বর্ষার দিনে যখন আকাশে কালো করে মেঘ ঘনিয়ে আসে, অবধারিতভাবে মনে পড়ে কালিদাসের মেঘদূতের সেই চিরবিরহী যক্ষের কথা। সে বেচারী ছিল কুবেরের উদ্যানপালক। কর্তব্যে অবহেলা করে সাজা পেল, স্বর্গ ছেড়ে তাকে স্ত্রীবিরহিত হয়ে নির্বাসনে আসতে হল পৃথিবীর রামগিরি পাহাড়ে। আট মাস যক্ষের সহনীয় হল কোনক্রমে, কিন্তু পয়লা আষাঢ় যখন বর্ষা নামল, তখন স্মৃতিবিধুরতায় সে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ল। কিন্তু কেন এই বিরহ কাতরতা? বর্ষাগমে কেন অবধারিতভাবে স্মৃতি এসে ভিড় করে? বৃষ্টি নিজেই তো সুদূরে পাড়ি দেবার পর অন্তিমে ঝরে পড়ে মাটিতে, এই অবনমন ও তার আগেকার নভোপরিক্রমার কি কোন সাজুয্য রয়েছে মানুষের মনের সঙ্গে? দেখা গেছে, আকাশে মেঘ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের পুরনো দুয়ার একটু একটু করে খুলে যেতে থাকে। আর সুখের স্মৃতি নয়, মন কেন যেন নির্বাচন করে দুঃখের স্মৃতি, কিংবা এমন সুখকর অতীত, যা আর ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন, 'বাদলা দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না, ফিরবে না, ফিরবে না সে'। বুকভরা বিফল হাহাকার মর্মবিদ্ধ করে তোলে, তবু বিরহীমন তা উপভোগ করে, করতে ভালবাসে।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বিরহী যক্ষ যতই প্রিয়াবিরহে কাতর হোন না কেন, বর্ষা এখন যেন অধরা মাধুরী। আর যদিও-বা থাকে, মেঘ-বজ্রের এমন ঘনঘটা যে, মৃত্যুর শংকা মাথায় নিয়ে বর্ষা উদ্‌যাপন বুঝি আর সম্ভবপর হয় না! কাজেই রবিঠাকুর বর্ষা নিয়ে যতই গান বাঁধুন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়' কী আর প্রেমিকমনে আলোড়ন তুলবে?

তবু বর্ষা আসুক আমাদের জীবনে, আমাদের পৃথিবীতে, আমাদের বাংলায়। বর্ষা নতুন প্রাণের বারতা নিয়ে আসুক, এই কামনা।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিকভাবে যোগ দিবস পালনে ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারতের উত্থাপিত এক খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এবং ২১ জুন দিবসটি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এবছর তৃতীয় যোগ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ হাজার লোক গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যোগ দিবস উদযাপনের সূচনা হয়।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগের বহুল প্রচার ছিল এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল যোগ ও ধ্যান। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন জাপান তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায়। যোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি চর্চিতব্য বিষয়। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই বরং এটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না বরং এতে মন বন্ধনহীন উন্মুক্ত হয়। দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ

ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।

২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় সাধারণ পরিষদে ঐ খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জাতিসংঘের ১৭৭টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা ঐ খসড়া প্রস্তাবের প্রতি ঢালাও সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এটি কোন ভোট ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান। এ ধরনের উদ্যোগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এত সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্য এর আগে আর সমর্থন জানাননি।

২১ জুন ২০১৭ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ হাজার লোক গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার। ভারতীয় হাই কমিশনার ও হাই কমিশনের কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনেক সাংস্কৃতিক তারকা ও সুপরিচিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্বও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া সংগঠন, যোগ সংগঠন, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও বার্তা প্রচারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অভিন্ন যোগ প্রটোকলের ওপর একটি নতুন যোগ এ্যাপ ছাড়াও ভারতীয় হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রার* একটি বিশেষ যোগ সংখ্যাও প্রকাশ করা হয়। এরপর ভারত ও বাংলাদেশের যোগগুরুদের আসন প্রদর্শিত হয়। শেষে স্টেডিয়ামে উপস্থিত সবাই অভিন্ন যোগ প্রটোকল অনুশীলন করেন।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে অবস্থিত সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন এসব ছাড়াও বিভিন্ন যোগ সংস্থা আলাদা আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন করে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তারকাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারকা বন্ধু ও যোগ প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে সবাইকে অংশগ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঢাকার যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারত থেকে দুই যোগগুরু শ্রীমতী অদিতি গুঁই ও শ্রী সুমিত কুমার বাংলাদেশে আসেন।

● নিজস্ব প্রতিনিধি

ইফতারি-নৈশভোজে আপ্যায়ন...

১৫ জুন ২০১৭ বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন চ্যাঞ্চেরি কমপ্লেক্সে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সরকার, সংসদ, রাজনৈতিক দল, সশস্ত্র বাহিনি, ব্যবসায় ও সংবাদ মাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক ইফতার ডিনারে আপ্যায়িত করেন। ডিনারের থিম ছিল তদানীন্তন অযোধ্যা (বর্তমান লক্ষ্ণৌ)-র রাজপরিবারের সংস্কৃতি। অতিথিদের ভারতের এক মাস্টার শেফের প্রস্তুতকৃত রান্না 'দম পোক্ত' পরিবেশন করা হয়

শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন

২৫ জুন ২০১৭ ঢাকার স্বামীবাগে ইশকন মন্দিরে বাংলাদেশের প্রধান রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদযাপন করে থাকেন। উৎসবে যোগ দিতে আশেপাশের গ্রাম ও নগর থেকে বিপুলসংখ্যক হিন্দু ঢাকায় সমবেত হয়। ঢাকায় ১৫ হাজারের বেশি ভক্ত তাদের পরিবার পরিজন ও বাচ্চাদের নিয়ে উৎসবে যোগ দেন।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, খাদ্যমন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলাম, মেট্রোপলিটান পুলিশ প্রধান জনাব আসাদুজ্জামান মিয়া, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব-উল আলম হানিফসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইশকনের এ রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম, শহর ও জনপথ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে রথযাত্রা উৎসব উদযাপনের খবর পাওয়া গেছে।

ব্যবহার উপযোগী ভারতীয় ভিসা

আরো ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পর্যটক ভিসা আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার ব্যবস্থা সহজ করা হয়েছে। নতুন সহজ ব্যবস্থায়, সাক্ষাৎকারসমূহ কেন্দ্র অনুযায়ী বরাদ্দ করা হয়েছে। ভিসা আবেদনকারীরা তাদের টুরিস্ট ভিসা আবেদন মতিঝিল, গুলশান, উত্তরা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোর, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেটের আইভিএসিকেন্দ্রসমূহে জমা দিতে পারবেন। একজন আবেদনকারী এখন তার আবেদনপত্র পূরণ করার পর তার বাড়ির নিকটবর্তী আইভিএসি কেন্দ্রকে বেছে নিতে পারবেন। বরাদ্দকৃত কেন্দ্রটি আবেদনপত্রে মুদ্রিতও থাকবে। ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ে তার আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রে যাবেন। আবেদনকারী তার ফরমে উল্লেখিত কেন্দ্রেই কেবল তার আবেদন জমা দিতে পারবেন, অন্য কেন্দ্রে নয়। এই উদ্যোগ আবেদনকারীদের আইভিএসিকেন্দ্রসমূহ বেছে নেওয়ার পথ সুগম করবে। সকল আবেদনকারী এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

ভিসা আবেদনকারীদের জ্ঞাতব্য

ভিসা আবেদনকারীরা জাল ডলার এনডোর্সমেন্ট ও ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ ভূয়া কাগজপত্র সংবলিত ভিসা আবেদনপত্রজমা দিচ্ছেন এমন একাধিক

নজির ভারতীয় হাই কমিশনের গোচরে এসেছে।

ভিসা আবেদনপত্রে তারা যে তথ্য দেবেন তার জন্য আবেদনকারীরা দায়ী। তাদের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল তথ্য দান নিশ্চিতকরতে হবে। অসত্য তথ্য বা ভূয়া কাগজপত্র জমা দিলে আবেদন তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হবে।

ভারতে প্রবেশ-প্রস্থানের বিধিনিষেধ সহজ হল

সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ২৪টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং হরিদাসপুর ও গেদের সমন্বিত চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে যাতায়াতকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভিসায় প্রবেশ/প্রস্থান নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলির মধ্যে রয়েছে আহমেদাবাদ, আমৌসি (লক্ষ্ণৌ), বারনসী, ব্যাঙ্গালোর, কালিকট, চেন্নাই, কোচিন, কোয়েম্বাটোর, ডাবোলিম (গোয়া), দিল্লি, গয়া, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, কলকাতা, ম্যাঙ্গালোর, মুম্বই, নাগপুর, পুণে, অমৃতসর, ত্রিচি, ত্রিবান্দ্রম, বাগডোগরা এবং চণ্ডীগড়।

সংশোধিত নির্দেশিকাটি ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও যাতায়াতকে আরো সুগম করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

বারিধারায় কত্থক নৃত্যের ক্লাস শুরু

যোগের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সমতা সুপ্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। যোগ ব্যায়ামে হস্তমুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় যেমন– পতাক, সংন্দশ, অঞ্জলি ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় এই হস্তমুদ্রার ব্যবহার অসংখ্য এবং তা গভীর সংযমের সঙ্গে অভ্যাস করতে হয় এবং নৃত্যের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। যোগভ্যাস যেমন শুরু করা হয় প্রার্থনা দিয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যও তেমনি শুরু করা হয় বন্দনা বা প্রার্থনা দিয়ে। বর্তমান ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যোগ, নৃত্য প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনজাত উদ্ভাবনা প্রচারে সদা সক্রিয়।

সাড়ম্বর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের অব্যবহিত পরেই তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু মুনমুন আহমেদের সঙ্গে আলাপ করে বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনে ১ জুলাই ২০১৭ থেকে কত্থক নৃত্যের ক্লাস শুরুর উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা ও ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দুটি ব্যাচে ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কত্থক নৃত্যে আগ্রহী সকলকে ঐ ক্লাসে যোগদানের আহবান জানানো হয়। নৃত্য ক্লাসের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা করে ফি ধার্য করা হয়েছে। ৬-মাস মেয়াদী কোর্সটি সম্পন্ন হবার পর সফল অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতার ভিত্তিতে পারদর্শিতা সনদ প্রদান করা হবে।

● নিজস্ব প্রতিনিধি

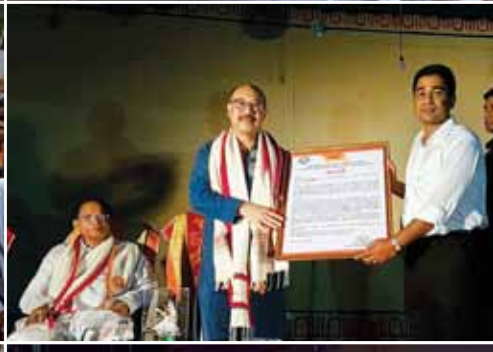

সিলেটে হাই কমিশনারের কর্মব্যস্ত দিন...

১১ জুন ২০১৭ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি শ্রী সুরেন্দ্রকুমার সিনহা ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় ভারতীয় অর্থায়নে নির্মিত ২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রতিটি প্রকল্পের খরচ বাংলাদেশি ২.৫ কোটি টাকা। পরে হাই কমিশনার জেলার এস কে সিনহা স্কুল এন্ড কলেজ উদ্বোধন করেন এবং স্কুল পাঠাগারের জন্য কিছু বই উপহার দেন। এরপর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত মণিপুরী নাচ-গানের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

প্রবন্ধ

যখন বৃষ্টি নামল...

কল্যাণী প্রসার

বর্ষা যখন ভারতের ওপর পাখা বিস্তার করে, তখন চারিদিক সবুজে-শ্যামলে ঝলমল করে ওঠে। আমরা বারিধারার অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য কয়েকটি সেরা জায়গা বেছে নিয়েছি...

আপনি যদি প্রকৃতিকে ভালবাসেন, নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে, কিভাবে জল নিসর্গকে বাদামী থেকে সবুজে রূপান্তরিত করে। এবার ভাবুন, চারিদিকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, আর আপনি বনের মধ্যিখানে বসে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন... ভারতে বর্ষায় ছুটি কাটানো তখন আপনার জন্য উদ্‌যাপন হয়ে উঠবে।

ডিব্রুগড়, আসাম

বছরের যে-কোন সময় চা-বাগান মনোরম দ্রষ্টব্য কিন্তু যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর বজ্রবৃষ্টির মুষলধারে সবুজের গালিচা জীবন্ত হয়ে ওঠে আর আপনি তার মধ্যিখানে গিয়ে পড়েন– নানা রঙের সবুজ আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। দেশের বৃহত্তম চা রপ্তানিকারক রাজ্য হিসেবে বিখ্যাত আসামের এই শহরটি বর্ষায় দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। পূর্ব-ভারতের খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে অবস্থিত ছোট্ট শহরটি অভাবনীয় রকমের সবুজ– শুধু চা বাগানগুলো নয়, দুটি জাতীয় উদ্যান এবং বৃষ্টিবিধৌত অরণ্যানী। একটা ছাতা বাগিয়ে নিয়ে চা বাগান ঘুরতে বেরিয়ে পড়ুন। বৃষ্টির দিন, চা বাগানের বাংলোর রাবান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসে আসামের সেরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করুন অবিশ্বাস বারিধারার টাপুর টুপুর টুপ্ টাপ্...

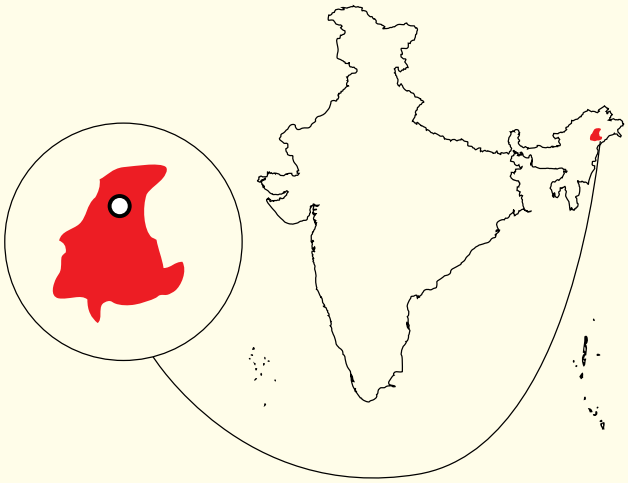

দেশের সর্ববৃহৎ চা রপ্তানিকারক রাজ্যের রাজধানী ডিব্রুগড়ে রয়েছে একাধিক বৃষ্টিবিধৌত বনাঞ্চল ও জাতীয় উদ্যান

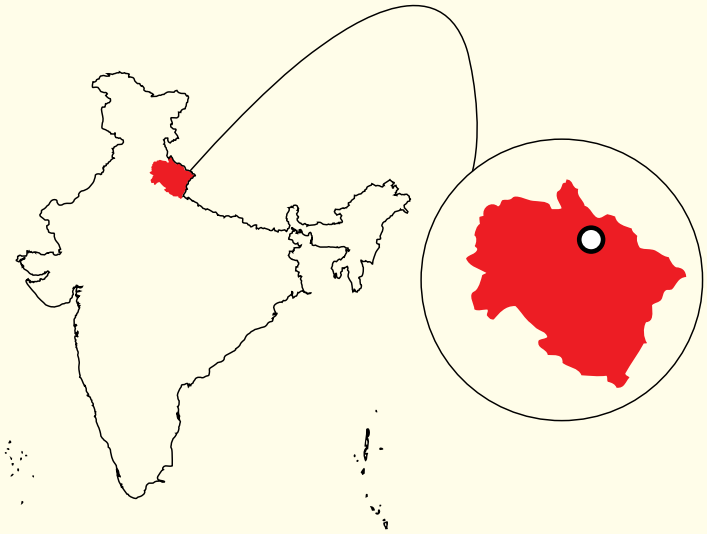

বর্ষাঋতুতে প্রায় তিনশো আলপাইন ফুল আপনাকে অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য...

ফুলের উপত্যকা, উত্তরাখণ্ড

অনিঃশেষ ফুলরাজি, বিরল উদ্ভিদ ও বিপন্ন জীবজন্তু ও পাখির আশ্রয়স্থল ফুলের উপত্যকা জাতীয় উদ্যান প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য অফুরান আনন্দের উৎস। এখানে পৌঁছতে হলে আপনাকে যোশীমঠ থেকে ১৭ কিলোমিটার পাকদণ্ডী বেয়ে উপরে উঠতে হবে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন কিংবা হরিদ্বার থেকে সড়ক পথে আসা যায়। পুষ্প উপত্যকার উজানপথে বাতাস আমোদিত করে দাঁড়িয়ে থাকা কত কত গ্রাম আর বুনো ফুলের মাঠ আপনি পেরিয়ে যাবেন। হেঁটে যাবার সময় বুনো গোলাপের সৌরভ নিন আর বৃষ্টিবিধৌত ফুলেল নিসর্গের সজীবতা উপভোগ করুন। উপত্যকা ঘুরে আসার সেরা সময় হচ্ছে আগস্টের অব্যবহিত পরের দিনগুলো যখন রঙে চারিদিক ছয়লাপ...

কয়না, মহারাষ্ট্র

বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চল হিসেবে আপনার কাছে প্রতিভাত হবে– এটা হচ্ছে পাগল করা মেঘ-রৌদ্রের খেলা দেখবার সবচেয়ে চমৎকার সময়। চিপলুন ও কড়রের মধ্যিখানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত শহর হচ্ছে কয়না। কয়না বাঁধ নয়ন মনোহর আর শহরটি ঝর্না, জলাশয় ও কয়না বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জন্য দ্রষ্টব্য। এখানে আপনি ডোরাকাটা বাংলার বাঘ ও আর বিরল প্রজাতির পাখি দেখতে পাবেন। এখানেই এশিয়ান ফেয়ারি ব্লুবার্ডের দেখা পাবেন আপনি।

এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত না হওয়ায় কয়না শহরটি বেশ শান্ত আর নিরিবিলি। কয়না বাঁধের কাছে অসংখ্য রিসোর্ট আর বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে...

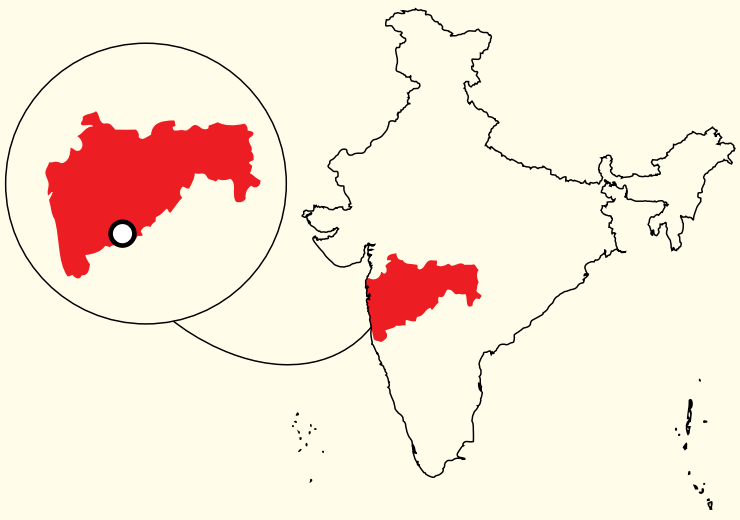

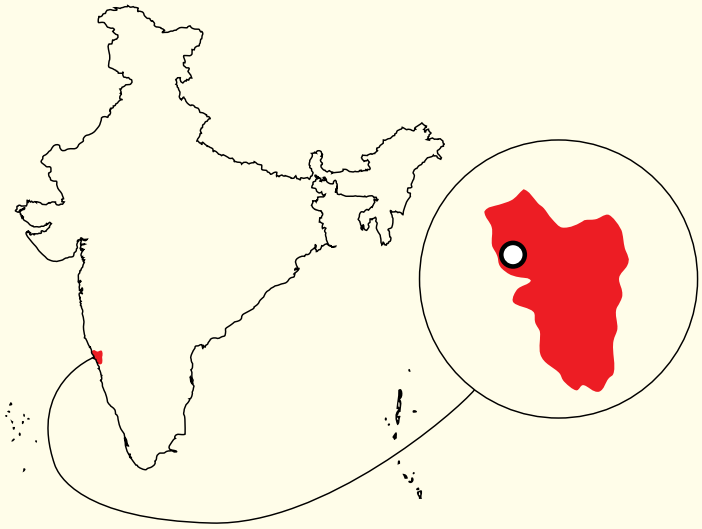

মসলাবীথির মাদকতাপূর্ণ সৌগন্ধের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান কিংবা গোয়ার মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলুন আর উপভোগ করুন বৃষ্টির সৌন্দর্য...

কুরগ্, কর্নাটক

দক্ষিণ ভারত হচ্ছে সৌভাগ্যবতী সেরা অঞ্চল কারণ বর্ষাঋতু এখানে আসে সবার আগে, যায় সবার শেষে। ভারতের অন্যতম বৃষ্টিপ্রধান কুরগ্ সুপরিচিত এর কফি বাগান আর মাদকতাপূর্ণ সবুজ অরণ্যের জন্য। যখন বৃষ্টি নামে আর বৃষ্টিধোয়া দূরের আকাশে রামধনু ওঠে, আপনি বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে পারবেন না। ধোঁয়া-ওঠা কফিতে চুমুক দিতে দিতে আপনি উপভোগ করুন জলীয় বাষ্পের কুণ্ডলী, সবুজ অরণ্যকে সাদা চাদরে মুড়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে... দেখে নিন কাবেরী নদীর উৎসস্থল কিংবা নগরহোল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ঝর্না, পাহাড়, জিভে জল-আনা মুখোরোচক রান্নার স্বাদ নিতে আপনি বার বার কুরগে ফিরে আসবেন।

গোয়া

পশ্চিমভারতের জনপ্রিয় ও পর্যটকে ঠাসা গোয়া যদি আপনার অপছন্দ হয়, চলে যান বর্ষাকালে... যখন অতিথি বৃষ্টি সময়-অসময় না মেনে অঝোরে ঝরতে থাকে। আপনি হয়তো সমুদ্রসৈকত কিংবা পর্যটক-আকর্ষক দ্রষ্টব্য বেশি দেখতে পাবেন না, কিন্তু বর্ষার মধ্যে গাড়ি নিয়ে গোয়া ঘুরে বেড়াতে আপনার ভালই লাগবে, সেও আপনার জন্য এক আনন্দের অজ্ঞিতা হয়ে থাকবে। মান্দবী নদীর ওপর দুধসাগর জলপ্রপাতের নাটকীয় দৃশ্য আপনাকে বিস্মিত করবেই। মসলাবীথি কিংবা গ্রামের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালানো অবিস্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে আপনার জীবনে।

কুর্গ বিখ্যাত এর কফি বাগানের জন্য। এখানে আছে দৃষ্টিনন্দন পর্বতমালা, ঝর্না, ধান ক্ষেত ও বনাঞ্চল...

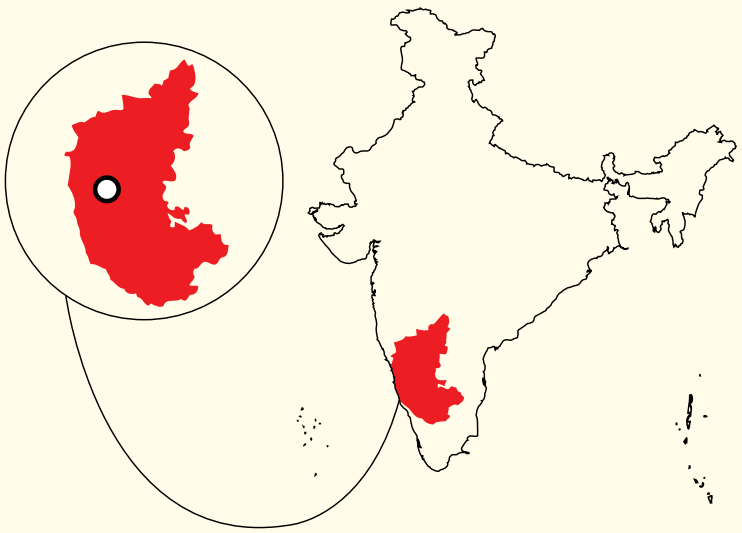

প্রবন্ধ

ঐতিহ্যের ধামাইল গানে রাধারমণ

বিশ্বজিৎ রায়

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে নৃত্য সংবলিত গীতের প্রাধান্য থাকলেও সমাদৃত হয়েছে শ্রীহট্টের ধামাইল। রাধারমণ সংগীতে লোকসংশ্লিষ্টতা বেশি এটি সর্বজন স্বীকৃত। আর এও স্বীকৃত যে, এই সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গ্রামবাংলার নারী সম্প্রদায়। লোকাচারের বিভিন্ন অনুসঙ্গে রাধারমণসংগীত হচ্ছে লোকনারীর সঙ্গী। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ অন্নপ্রাশন, মঙ্গলাচরণ, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নারীরা একত্রিত হয়ে যে আঙ্গিকের গান করেন, তার নাম ধামাইল গান। প্রায় পনের-বিশ জন নারী বৃত্তাকারে বিন্যাসিত হয়ে তালেতালে হাততালি দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এ সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। লোকবাংলার এ অঞ্চলের অন্দরমহলের এ বিনোদনের জনপ্রিয় রূপকার হচ্ছেন রাধারমণ দত্ত। নারীসম্পৃক্ততার জন্য একে মেয়েলিসংগীতও বলা হয়ে থাকে। এমনকি তার ধামাইল সর্বজনীন সম্প্রতির একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মুসলিম বিয়ে, বৌভাত, খাতনা ও মেয়েদের অলংকার পরার দিনও গ্রামগঞ্জের কোন কোন পরিবারের ধামাইল গীত হয়ে থাকে।

রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে বাদ্যযন্ত্রের প্রবেশ না থাকলেও ঘরোয়া পরিবেশে মহিলারা কয়েকজন মিলিত হয়ে ধামাইল গান করে আনন্দ ও তৃপ্তি পান। এক্ষেত্রে ধামাইল গায়িকাদের বিশেষ ভঙ্গিতে পা ফেলার শব্দ ও হাততালির শব্দ ধ্বনির ঐকতানে বাণী ও সুরের দ্যোতনায় নারীহৃদয় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রাধারমণ দত্তের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ আচারকেন্দ্রিক বিশেষ বিশেষ সংগীত আছে যেমন– বাদ্যবরণ, সতুরকাটা, পানখিলি, পাশাখেলা, রূপসংগীত ইত্যাদি। যেখানে অন্তরমহলের রমণীয়তাকে আচার ও মানসিকতায় প্রকাশ করে। এই গানগুলো মূলত ধামাইল গানের মোড়কে প্রকাশিত ।

ধামাইল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, 'ধামা' শব্দ থেকে 'ধামাইল' শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ ভাব। তবে, আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হয় 'উঠোন'। যে ধারণা থেকে একথাটির উৎপত্তি তা হল, রাধারমণ দত্ত ভাবুক প্রকৃতির হওয়ায় এই জাতীয় নামের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ মনে করেন বাড়ির উঠোনে এই গান-নাচের আয়োজন করা হয় বলে একে ধামাইল নৃত্যগীত বলে (বাংলা উইকিপিডিয়া)। 'দমাদম মস্কালেন্দর' জনপ্রিয় এই গানটিও ধামাইল গানের অর্ন্তভুক্ত। পীরের দরগায় নৃত্যসংবলিত গানকে বলা হয় ধামালী। যদিও উক্ত গানটির সঙ্গে আধুনিক সুর ও নৃত্য যুক্ত করা হয়েছে। চৌদ্দ শতকেও ধামাইল গানের প্রচলন ছিল। তবে এই গান বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ঝুমুর ও ধামাইলের লক্ষণ সুস্পষ্ট। রঙ্গ-কৌতুক বা চাতুরী অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ধামালী শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন–

ধামালী বুলিতে কাহ্নে দিহলি আস
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ (দানখণ্ড)

কেউ যদি সিলেট বেড়াতে আসে, আর গান শুনতে চায় তাহলে তারা শোনাবে ধামাইল গান– যা শ্রীহট্টের ঐতিহ্য। মাটির সুরের খোঁজে সিলেট এসেছিলেন কবি রণজিৎ সিংহ ও খালেদ চৌধুরী। এই ধামাইল গানে যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, অভাব-অভিযোগ উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু।

গুরুসদয় দত্ত তাঁর *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য* গ্রন্থে বলছেন, 'সে যেন এক অতীত যুগের কথা, তখনও সেই সুদূর পল্লীর (শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ সাব-ডিভিশনের বীরশ্রী গ্রাম) কোন লোক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পায় নাই। আমার বাল্যকালের সেই পল্লীর জীবন ছিল নির্ম্মল নৃত্যগীতে ভরা। বাউলরা গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, মুসলমানরা মহরমের সময় 'জারি' গান গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, এবং 'সারি' গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিত, এমনকি হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময়ে তাহারা নৌকা বাইচের অভিনয় করিয়া গাহিত ও নাচিত। ছেলেবেলায় আমরাও তাহাদের সহিত গাহিয়াছি, নাচিয়াছি। এমনকি আমাদের গ্রামের ভদ্রমহিলারাও বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা পর্ব্ব এবং 'জলভরা' ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে অতি সহজ ও নির্ম্মলভাবে গাহিয়া গাহিয়া নাচিয়াছেন।'

পানখিলি সংগীত থেকে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য 'পান-গুয়া' (পান-সুপারী) বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আয়োজন। বিবাহ ছাড়াও গ্রামে-গঞ্জেও 'পান-গুয়া' দিয়ে প্রাথমিক আপ্যায়ন সিলেট-সুনামগঞ্জের একটি প্রাচীন এবং আধুনিক কালেরও প্রচলিত আপ্যায়নরীতি।

সুবর্ণের সর্তায় গুয়া কাটিলা তখন।
জিরা কাটি সব রমণী আনন্দিত মন
জামাইর মায়ে কাটইন গুয়া দেখিতে সুন্দর
রমণ বলে পানখিলির হইল শুভক্ষণ।

'ধামালি' শব্দের ই-কারের অপিনিহিতি হল 'ধামাইল' শব্দটি। বাংলা একাডেমি প্রণীত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে 'ধামালি' শব্দের অর্থে লেখা হয়েছে অঙ্গভঙ্গি করে নাচগান আর ধামাইল শব্দের অর্থে লেখা হয়ে 'রাধারমণের ধামালি গান'। দীন শরৎ, মহেন্দ্র গোসাই প্রমুখের নাম বাদ দিলে বর্তমানে ধামাইল গান বলতে রাধারমণের ধামাইল গীতকেই বোঝায়।

রাধারমণের ধামাইল গানের কথা বলতেই হয়। অনেকেই মনে করেন, তিনিই ধামাইল গানের প্রাণপুরুষ। এ ভাবনার কারণ আছে, রাধারমণের রচনার বেশি অংশ জুড়ে ধামাইলের ছন্দ ও নৃত্য জড়িয়ে আছে। ধামাইল নৃত্যগীত সিলেট অঞ্চলের লোক ঐতিহ্য। কামরূপ বা পূর্বদেশের সংস্কৃতিতে এই ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। মহিলাদের দলবদ্ধ নৃত্যগীত এটি। ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ জাতি-সম্প্রদায়নির্বিশেষে যে-কেউ এতে অংশ নিতে পারে। ধামইল নৃত্যগীত নামক হাতিয়ার দিয়ে মহিলারা সামাজিক বন্ধন এতটাই সুসংহত করেছে যে, আজো গ্রামে-গঞ্জে যে কোন প্রকার মাঙ্গলিক উৎসবে এর জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। ধামাইল এতদ্অঞ্চলের জাতীয় লোক নৃত্যগীত হিসেবে স্বীকৃত।

ভাটিপ্রধান দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। কৃষিপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় হাওড়বেষ্টিত এ অঞ্চলে ছয় মাস মানুষের অলস সময় কাটে। দুই বা ততধিক মহিলার অলস সময়ে একসঙ্গে বসে হাসি-ঠাট্টা করাকে নিন্দাচ্ছলে বলা হত 'ধুম্বইল' দেওয়া। এই ধুম্বইল যখন নৃত্যগীতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে বলা হত ধামাইল। শুধু গান হলে ধামাইল গান আর নাচ হলে ধামাইল নাচ। ধামাইল গান অত্যধিকভাবেই তাল-লয় আশ্রিত। বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যকেন্দ্রিক নয়। সুতরাং গীতকে কেন্দ্র করেই এই ধামাইল নৃত্য। ধামাইল গান ত্রিমাত্রিক ছন্দের স্বতন্ত্র রীতির গান। 'ধামাইল গানের নিজস্বতা কথায় নহে, উহার বিশিষ্ট সুরে ও গায়ন রীতির মধ্যে।'৩

ধামাইল গানে মহিলা শিল্পীরা সাধারণ পোশাকেই থাকেন। এজন্যে বাড়তি কোন সাজগোজের প্রয়োজন নেই। শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর লোকসঙ্গীত সমীক্ষায় বলেছেন– 'লৌকিক নৃত্যে বাংলাদেশ অত্যন্ত দীন, যা-ও বা ছিল তাও লুপ্তপ্রায় বা বিকৃত। কিন্তু শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্যধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাঁদের ধামাইল নৃত্যে। সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ধামাইল গান। শ্রীহট্ট জেলার এ একান্তই নিজস্ব জিনিস। বাংলার লোকসংগীতে বৈরাগ্য ও বিচ্ছেদেও অন্তর্লীন ভাবটি প্রধান্য পেয়েছে। কিন্তু, ধামাইল গান ভাবের দিক থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম করে পার্থিব উল্লাসে ভরপুর। জন্ম, বিবাহ বা কোনো উৎসব প্রভৃতির আনন্দলগ্নে ধামাইল নাচ ও গানে গ্রামের মেয়েরা সমবেত হন। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমবেত করতালি গভীর রাত্রির নীরবতাকে ছন্দিত করে তোলে বিভিন্ন লয়ে।... ধামাইলের বহু রূপ আছে। কিন্তু সুরের দিক থেকে তা মূলতঃ ভাটিয়ালির ঠাটের ভিতরেই। তবে, ভাটিয়ালির টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকাতে প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে।"৪

একমাত্র মৃত্যুবিষয়ক অনুষ্ঠান ছাড়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এমন কোন অনুষ্ঠান নেই যেখানে ধামাইল পরিবেশন না হয়। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতবেত্তা শ্রী শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় ১৯৫৪ সালের শারদীয় দেশ সংখ্যায় এই নৃত্য সম্পর্কে লেখেন,

'মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ি পরে গোল হয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হলো, 'যুগল মিলন হইল, দেখ দেখ সখি শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল...' গান ও নাচ আরম্ভ হলো ঢিমালয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রুত ছন্দে বাড়তে লাগলো। এ নাচটির নাম ধামাইল। অনুমান করি, গানগুলিকে ধামাইল বলা হয় বলেই বোধ হয় নাচগুলিও সেই নামেই পরিচিত। এই নাচটি গ্রামাঞ্চলের সমাজে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানা উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়।'

আবার বলেছেন– 'এই দলবদ্ধ নাচটি শান্ত প্রকৃতির নয়। অনেকটা জোরালো। পা তুলে মেয়েরা নাচলো, পায়ের ভঙ্গির বৈচিত্র্য কিছু বেশি।হাততালি এ নাচের একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক পদচালির সঙ্গে নানা ছন্দে একবার করতালি থেকে সাতবার পর্যন্ত করতালিতে শব্দ করে তারা নাচলো, পুরো একপদ চালিতে অধিক সংখ্যক করতালি সন্নিবেশ করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয়। করতালি দিয়ে নাচবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে, হাতের ভঙ্গিও... বেশি। কখনো বা হাত কোমড়ে দিয়ে, ডান হাতে ভঙ্গী করে, কখনো কোঁচড় থেকে কিছু দিচ্ছে এই রকম ভঙ্গি করে নাচতে লাগল। বৃত্তাকারে ডানদিকে পাশাপাশি কিংবা একজনের পিছনে অপরে ঘরতে লাগল। এ নাচটি শেষ হতে সময় লাগল প্রায় মিনিট পনেরোর মত।'

রাধারমণের ধামাইল গানে বিচিত্র বিষয় উপস্থিত। ০১. জল ধামাইল, ০২. গোষ্ঠ ধামাইল ০৩. গৌর ধামাইল, ০৪. মিলন ধামাইল। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ধামাইল রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি রাধারমণের বেশীর ভাগ রচনাই ধামাইল আঙ্গিকে রচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

জল ধামাইল

জলে গিয়াছিলাম সই
এগো কালা কাজলের পাখি দেইখা আইলাম কই॥
সোনার পিঞ্জুরা সই গো রূপার টাঙ্গুনি
এগো আবের চান্দুয়া দিয়া
পিঞ্জুরা ঢাকুনি॥
পালিতে পালছিলাম পাখি দুধকলা দিয়া
এগো যাইবার কালে বেঈমান পাখি
না চাইলো ফিরিয়া॥
ভাইবে রাধারমণ বলে পাখি রইল কই
এগো আইনা দে মোর প্রাণ পাখি
পিঞ্জুরাতে থুই॥

গোষ্ঠ ধামাইল

বাঁশির ডাকে কমলিনী রাই রে সংগীলা ভাই
বাঁশিরে ডাকে কমলিনী রাই ॥
নেও আমার শিঙ্গা বেণু তোমরা সবে চরাও ধেনু
আমি তার অন্বেষণে যাই ॥
যে রাধার কারণে আমি ধেনু চরাই বনে ভ্রমি
ঐরার চরণে বিনমূলে বিকাই ॥
উন্মাদ হইয়া আমি ছাড়ি আইলাম বাপ ভাই
এখন দেখি দুই কুল নাই ॥
রমণ কয় শুনো হরি চরণে বিনয় করি
বিকাইলে কি তোমার দেখা পাই ॥

গৌর ধামাইল

সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়
নাচে নাগরী গো সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়॥
সুন্দর কপালে সুন্দর তিলকে
সুন্দর নামাবলী গায়।
সুন্দর নয়ানে চায় ওসে যার পানে
দেহ থুইয়া প্রাণটি লইয়া যায়॥
সুন্দর মুখের হাসি কিবা দিবা কিবা নিশি
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায়।
না জানি কার ভাবে বসে কখন হাসে কখন ভাসে
বাহু তুলে হরি গুণ গায়॥
যখন গৌরায় গান করে নৈদাবাসীর ঘরে ঘরে
শুইনা আমার তাপিত প্রাণ জুড়ায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখবি যদি আয় সকলে
জন্মের মতন বিকাই রাঙা পায়॥

মিলন ধামাইল

মিলিল মিলিল মিলিল রে
আজ কুঞ্জে রাধা কানাই মিলিল রে
শ্রীরাধিকার প্রেম রসে বিচিত্র পালঙ্ক ভিজে
কানাইর মাথার চূড়া হেলিল রে॥
শ্যামকুঞ্জের জল অতিব সুশীতল
মকর কুঞ্জে কানাই শোভিল রে॥
ভাইবে রাধারমণ কয় রাধা কানুর মিলন হয়
মধুর বৃন্দাবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে॥

এই ধামাইল গানের সাথে একমাত্র বাদ্য বাজে ঢোলক। রাধারমণের সকল গান নিয়ে কথা বলতে গেলে, তাঁর ধামাইল গানের প্রকৃতিটিই সামনে এসে দাঁড়ায়। সংখ্যাধিক্যের দিক থেকেও রাধারমণের গানে ধামাইলের সংখ্যাই বেশি। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও নানা বিষয়ের ধামাইল গানের ছড়াছড়ি রাধারমণের গানে। রাধারমণ দত্ত ছাড়া আরো অনেকেই ধামাইল গান রচনা করেছেন। যেমন– শীতলং শাহ, কাশীনাথ দাশ তালুকদার, প্রতাপরঞ্জন তালুকদার, শাহ আব্দুল করিম, আরকুম শাহ্, দীন সুনীল, নন্দলাল, স্বপনকুমার, দ্বীজেন দাশ, আশীষ দেব প্রমুখ।

রাধারমণ সংগীতের বিস্তার, বিন্যাস ও বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যের জন্য তার জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। রাধারমণ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ভক্তিভাবের জন্য যতটা না তার চেয়ে অনেকগুণ লোকজীবন ও মানসকে স্পর্শ করার জন্য। লোকসমাজ ও মানসিকতার অনেকখানি জুড়ে আছে নারী। নারীর প্রেম, বিরহ, আচার, ঘর-গেরস্থালি সবই রাধারমণ সঙ্গীতের মহীমাকে বাস্তবতার মানবিক উপকরণে ঋদ্ধ করেছে। এ মানবিকতার উৎসমূলে আছে নারীর মানবিকবোধ। রাধারমণসঙ্গীতকে বুঝতে হলে নারীর এ রূপটিকে চিনে নিতেই হবে।

বিশ্বজিৎ রায়
প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুলাই

মহানায়ক উত্তমকুমার

০১ জুলাই ১৮৮২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু বেলুড় মাঠ
০৭ জুলাই ১৯০৫ ❖ প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪ ❖ রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮ ❖ অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম
১০ জুলাই ১৯০৯ ❖ কবি বিষ্ণু দে-র জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৯৯ ❖ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৬৩ ❖ কবি-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২ ❖ কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪ ❖ প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩ ❖ গায়ক মুকেশের জন্ম
২৪ জুলাই ১৯৮০ ❖ উত্তমকুমারের জন্ম
২৬ জুলাই ১৮৬৫ ❖ রজনীকান্ত সেনের জন্ম
৩১ জুলাই ১৮৮০ ❖ মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

ছোটগল্প

জীবনের জমাখরচ এবং যৌবন

সালেহা চৌধুরী

বাড়িটাতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। মনজুর হোসেন ষোল বছর পর বাড়িতে ফিরে আসছেন, চিরদিনের জন্য। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে পাঁচ বিঘা জমি বন্ধক রেখে, দালাল ধরে, তিনি মিডল ইস্টে চলে গিয়েছিলেন। এখন তার বয়স আটান্ন। এর মধ্যে পাঁচ বিঘা জমি ছাড়াতে তার প্রায় পাঁচ বছর লেগেছে। এরপর আরো পনেরো বিঘা করতে প্রায় দশ বছর। এত বছর কেবল টাকা জমিয়েছিন দেশে গিয়ে একটা ব্যবসাপাতি করবার জন্য। এর মধ্যে একবারো তিনি দেশে আসেননি। আসতে পারতেন। আসেননি। ভেবেছিলেন– সব হয়ে গেলে তারপর দেশে যাব, একেবারে। যেখানে জমিতে এখন বছরে প্রায় চাররকম ফসল ফলে, জমি আর আগের মত বসে থাকে না, সেচ ব্যবস্থার কারণে জমিতে সারাক্ষণই কিছু না কিছু চাষবাস হয় সেখানে কুড়ি বিঘার আয় অনেক। এ দিয়ে ছোটখাটো জমিদারি হয়ে যায়। বিদেশে থাকার কারণে যেটা সম্ভব হয়েছে। অনেকে পারে না। সব খুইয়ে চলে আসে। তিনি পেরেছেন। একা জীবন কীভাবে গেছে সে কথা কাউকে বলেননি।

স্ত্রীও বলেনি একা থাকা মাঝে মাঝে কেমন অসহ্য হয়ে যায় সে গল্প। একটা মেয়ে আর একটা ছেলে রেখে গিয়েছিলেন। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে ওর মা। সে-সময় প্রায় চার লাখ টাকা পাঠাতে হয়েছে তাকে। এটা পাঠাতে না হলে হয়তো তিনি আরেকটু আগে আসতে পারতেন দেশে। মেয়েটা ভালই আছে। পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে তার। একটা নাতিও হয়েছে। মেয়েটা বড় হল, বিয়ে হল, নাতি হল সবকিছুই তার চোখের আড়ালে। এক একদিন রাতে যখন ঘুম আসে না, তিনি তাকিয়ে থাকেন সেই ভবিষ্যতের দিকে যেখানে স্ত্রী আছে, তার হাতে ভালমন্দ রান্না আছে, তার সঙ্গে একসঙ্গে পান খাওয়া আছে, রাতের সুনিদ্রা-অনিদ্রা ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপার আছে। তিনি জানেন ছেলেটা পড়াশুনো অল্পদিনের ভেতর শেষ করে ফেলবে। তারপর হয়তো একদিন চাকরি পাবে। এখন আসছেন। কেন আসছেন সবটা খুলে বলেননি।

বাড়িটায় দুটো নতুন ঘর করেছে হালিমা। একটাতে ছেলেটা থাকে। আরেকটা বৈঠকখানার মত। হালিমা সকাল সকাল উঠেছে। বেশ একটু খুশি খুশি মন তার। ফলে বাতের ব্যথার কথা তার তেমন মনে নেই। তবু কাজের মেয়েটা এসে এক ফাঁকে তার্পিন তেল মালিশ করে গেছে।

আপনি তো মনজুরভাইওক বলেননি আম্মা আপনার যে বাত ধরিছে। কেন বলেননি?

সেটা কোন বলার কথা হল। ওখানে ওর কত সমস্যা। আমার অসুখের কথা, বাতের কথা বলে ওকে আরো চিন্তায় ফেলা কী ঠিক?

ইংকা দেখলে তার মন বেজার হবি না? খারাপ লাগবি না? বাতে আপনি একেবারে লোতা।

লাগলে কি করব। কাজের মেয়েটা বাতের তেল মালিশ করে, চুল আঁচড়ে দিয়ে চলে গেছে। একটা মেয়ে লাগিয়ে সারা বাড়ি পরিষ্কার করছে ওরা। ছেলে ঢাকা থেকে একটা বাড়ির নামের ফলক নিয়ে এসেছে। বাড়ির নাম– বায়াতে মনজুর। সেটাও মায়ের বাতের মত বাবাকে জানানো হয়নি। বাড়িটায় নতুন করে রং করিয়েছেন হালিমা। চাপকল এবং বাথরুমটাও নতুন। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাব আছে বাড়িটায়। বিশ বিঘা জমি। মাসে মাসে পাঠানো দশ হাজার টাকা। সেগুলো পাঠাতে মনজুর হোসেন ওখানে কি পরিমাণ কষ্ট করেছে তা হালিমার বাতের মত চিরকালই গোপন রেখেছে ওর স্বামী। আজ গোশ আর পোলাও খেলাম। আগামিকাল বিরিয়ানি খাব। আমরা সকলে মিলে সমুদ্রে গেলাম। কত কিছু দেখলাম। কত কিছু খেলাম। কেবল এই গল্প। এমন কথাইতো বরাবর বলেছে মনজুর হালিমাকে। বলেনি কতগুলো মানুষ একটা বাড়ি শেয়ার করত সে কথা। বলেনি কত সব অডজব করবার কথা। তারা এক্সপ্লয়টেড শ্রমিক। তারা বাংলাদেশ নামের এক গরীব দেশের শ্রমিক। সব কথা হালিমাকে বলা হয়নি। হালিমা জানে প্রতিদিন পরোটা, বিরিয়ানি, পোলাও, কোর্মা খাওয়া স্বামীর কথা। জানে যারা ছুটি-ছাটাতে বেড়াতে যায়। ঈদে-পরবে খুব হৈ চৈ করে। নতুন পাঞ্জাবি পরে আর চোখে সুর্মা লাগিয়ে বেড়াতে যায়।

আমি গেলে আর আসব না হালিমা। কাজেই আমি এখন যেতে চাই না। সব যখন হয়ে যাবে তখন যাব। প্রায় চিঠিতে এই কথা বলেছে প্রথম প্রথম। পরে ছেলে যখন মোবাইল এনে দিল তখনও তেমন কোন কথা।

আসব। বাকি জীবন থাকব। এখন একটু একা থাক।

তুমিও তো একা। বলেছে হালিমা।

কাজ নিয়ে আছি। একা না দোকা সে কথা মনে থাকে? যখন সব হবে চলে আসব।

সব? মানুষের জীবনে সবকিছু হয়ে যাওয়া কি এতই সহজ? পাঁচ বছর পর যখন বন্ধক দেওয়া জমিগুলো ছাড়ানো হল তখন একবার আসবার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কিন্তু মনে ভাবলেন– গেলাম জমি বন্ধক রেখে। পাঁচ বছর পর জমি ছাড়ালাম। এই দুই কারণে কি আমার বিদেশে আসা? না। অন্তত পক্ষে আরো দশ বিঘা জমি না হলে দেশে ফেরা ঠিক হবে না। তারপর আরো দশ বিঘা যখন হল জানলেন ঠিক দশবিঘায় একটা সংসার ঠিকমত চলে না। বিশ বিঘা হলে ভাল। তখন লেগে গেলেন বিশ বিঘা জমির টাকা পাঠাতে। তিনি সেই গাধা নাকের সামনে মুলো ঝুলিয়ে যাকে কেবল ছুটতে বলেছে। মেয়ের বিয়ের সময় চার লাখ টাকা পাঠাতে হয়েছিল। সেটা শোধ দিতে দুই বছর গেল। এরপর কলপাড় পাকা করা, বাথরুম, স্যানিটারি পায়খানা, একটা রঙিন টেলিভিশন, দুটো বাড়তি ঘর, চারপাশের শক্তপোক্ত দেয়াল। আরো কত কী। এসব করবার টাকা সংগ্রহ হলে জানলেন পনেরো বছর পার হয়ে গেছে। একদিন ঝপ করে মন ঠিক করলেন– দেশে যাব। ঝপ করে? কারণ তখন কাজ করবার শক্তি আর আগের মত নেই। সে কথা তাকে স্বীকার করতেই হল। পনেরো বছর ভুতের মত খাটুনির মাশুল দিয়েছে শরীরের নানা অঙ্গপ্রতঙ্গ, চোখের দৃষ্টি, মাথার ক্ষমতা। তখন ঠিক করলেন দেশে আসবেন। হয়তো ঠিক আরো পাঁচ বছর খাটতেন, আরো টাকা করতেন, কিন্তু শরীরটা কেমন যেন আগের মত আর কথা শুনতে চায় না। বিল্ডিং সাইটে সব তরুণ শ্রমিকের ভিড়। তার মত এমন একজন আগের মত কাজ পায় না। তরুণদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে তার আর ভাল লাগছে না। চাকরি বদলালে বেতন যায় কমে। এইসব যখন খুব ভাল করে জানলেন, তিনি দেশে ফিরবেন বলে মনস্থির করলেন।

আটান্ন বছরের একজন। একটা দোকান দেবেন। সংসারের ভেতরে থাকবেন মনজুর হোসেন। যেমন সবাই আশা করে।

হালিমাও বিরিয়ানি খাওয়ার মত নানা গল্প করেছেন স্বামীকে। বলেছেন– মেয়েটা সুখে আছে। জামাই খুব ভাল। তিনি বলেননি মেয়ের শাশুড়ির আগুনের মত ব্যবহার। তার ভয়ে মেয়েটা কেমন কেঁচো হয়ে থাকে। ছেলেটা পড়ছে কমার্স। বিবিএ। এবার এমবিএ করছে। সে কথা বলেছেন নানাভাবে। বাড়িতে দুটো নতুন ঘর হল। বাথরুম পাকা করলাম। তোয়ালে রাখার জন্য সুন্দর একটা র‍্যাকও করা হল বাথরুমে। কিন্তু বলেননি– নতুন বাথরুমে আছাড় খেয়ে পা ভেঙে গেছে। যেটা ঠিক হতে প্রায় দুই মাস লেগেছিল। বলেননি সামান্য একটা টেলিভিশনের জন্য মেয়েটাকে কতপ্রকার গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। তারপর তিনি বেশ কষ্ট করে মেয়েটাকে একটা ছোট টেলিভিশন দেবার পর মেয়েটা এখন একটু ভাল আছে। তবে শাশুড়ি তেমন বদলায়নি। বলেননি ছেলেটা শহরের কোন এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ও হয়তো এমবিএ করবার পর মেয়েটাকে বিয়ে করবে। মেয়েটা নাকি তার ছেলের চাইতে বয়সে বড়। কত কথা বলেননি হালিমা। শীতের রাতে মনে পড়েছে স্বামীর কথা। যখন বয়সটা বত্রিশ থেকে আটচল্লিশ হল সেই সব জীবনের একা থাকার দুঃখের কথা। বলেননি যারা স্বামী নিয়ে সংসার করে তাদের সঙ্গে তার জীবনের পার্থক্যের কথা। ভেবেছেন ভাতের কষ্ট যখন থাকে না সেটাই আসল সুখ। হয়তো কথাটা সত্যি। তারপরেও জারি নামে, মেঘ হয়, বিষ্টির রাতে কাঁথার ভেতরে একা লাগে, অন্ধকারে শেয়াল ডাকে, কোথা-কার জিনপরি মশ্‌মশ্‌ করে রাতের আঁধারে ছাদের উপর দিয়ে হাঁটে, ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে কোন সব মৃত আত্মারা, তখন পাশবালিশ নয় একজন মানুষের শরীর পাশে থাকলে কতটা পার্থক্য হয় সেসব বলেননি। অসুখে একা লাগে। নানা যন্ত্রণায় একা লাগে। কতসময় একা থাকা বুকের ভেতরে বাজে। ভাত আছে, তারপরেও এসব হয়।

ছেলে মোবাইল করেছে– মা আমি আব্বাকে আনতে এয়ারপোর্টে যাব। আমার দু'একজন বন্ধুও যাবে। একজন বন্ধু তার মাইক্রোবাস আমাকে ধার দেবে। সেটায় চেপে সোজা গ্রামে। আজকালতো সব জায়গায় পাকা রাস্তা। মাইক্রোবাসে অসুবিধা হবে না। মা বলেন– সাবধানে আনিস বাবা। পথে যেন কোন কষ্ট না হয়।

সে নিয়ে তুমি ভেব না মা। ছেলেটা বলে– মধ্যপ্রাচ্য থেকে চিরদিনের মত চলে আসা মানুষের কত সব জিনিসপত্র থাকে। মাইক্রোবাসে সুবিধা। মা বলেন– যেমন ভাল মনে হয় তেমন করিস রে বাবা।

ছেলে আবার ফোন করে– মা আব্বা আজ রাতে যেতে পারবেন না। আগামীকাল যাবেন। বলেন– আজ একটু বিশ্রাম করে কাল যাব রে বাবা।

ওর শরীর ভাল তো?

একটু টায়ার্ড। ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে। কাল খুব সকালে রওনা দিলে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে বাবা। যা ভাল মনে হয় তাই কর। বাড়ির খুব কাছে এসেও কেন একজন একটু বিশ্রাম নিতে চায়? একটু ভাবলেই হালিমা হয়তো বুঝতে পারতেন।

একটা খাট হয়েছে নিজেদের জন্য। সেখানে দুটো দুটো বালিশ পাশাপাশি রেখেছেন। বালিশে সুখে থাকা দুটি পাখি মুখোমুখি। সুজনির

লালচে রংটা চোখে পড়ার মত। মেয়ের জামাইকে দিয়ে শহর থেকে আনিয়ে নিয়েছেন। জামাই মাঝে মাঝে নিজের কাজে শহরে যায়। তার সারের দোকান। এখন হাঁটুর বাতটা নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে। সারাদিন বড় হৈ চৈয়ে গেছে। এখন হাঁটুটা সত্যিই কন কন করছে। এ খবর স্বামী জানেন না। মনে পড়ছে মনজুর হোসেনের সুঠাম শরীরের কথা। তার শক্ত শক্ত হাত পা। তিনি এখনও চমৎকার আছেন এমন কথাই তো বার বার জানিয়েছেন। বলেছেন– আমি খুব ভাল আছি। আমাকে নিয়ে ভাববে না। এমন একটা মানুষ পরিবারের ভাতের জন্য, ছাদের জন্য, একটু টাকা পয়সার সুখের জন্য একা জীবন কাটিয়ে দিল।

মা চুলে তেল দেব?

দাও। মাথা মেলে দিয়ে বসেন হালিমা। মেয়েটা সব চুল উঠে যাওয়া মাথায় চাপড়ে চাপড়ে তেল বসায়। তিনি বলেন– চুল নাই। দেখলে মন খারাপ করবে।

কাজের মেয়েটা হাসে। বলে– চুল নাই। রূপ নাই। সব গেছে। হামার স্বামীও ভিন দেশে মাটি কামড়ে পড়েছিল। তারপর যখন ফিরিছে হামি তখন থুরথুরা বুড়ি।

এত বক বক করবা না। আমি কি থুরথুরা বুড়ি নাকি?

সে কথা কইনি মা। আপনি এখনো সোন্দর।

কোনমতে পায়ে হেঁটে খাটের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। আজ রাতে নয়। আগামীকাল সকাল দশটার দিকে মনজুর আসছে। তিনি কী তাই? এখনো সোন্দর?

পরদিন সকালে কি এক সুখের আবেশে ঘুম ভাঙে তার। মনজুর হোসেন ষোল বছর পর বাড়িতে ফিরছে। বাতের কষ্ট ভুলে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামতে গিয়ে পায়ের জয়েন্টে একটু ব্যথা পান। সে ব্যথা বাড়তে থাকে। মন খারাপ হয়ে যায় তার। এত বছর পর একজন আসছে এক বাত জর্জরিত স্ত্রীর কাছে? একটা অপরাধবোধে মন খারাপ লাগে তার। ছেলে বলে– মা এক ঘণ্টার ভেতরে আমরা বাড়িতে আসছি।

তোর বাবা তোকে চিনতে পারল মোহসিন?

না মা। রেখে গিয়েছিলেন পাঁচ বছরের একজনকে। এখন সে একুশ প্রায় শেষ করেছে। চেনা শক্ত। তবে খুব বেশি কষ্টও হয়নি।

তুই চিনতে পেরেছিস?

না। তবে ধরে নিয়েছিলাম উনিই আমার আব্বা। লম্বা, ময়লা গায়ের রং। ওগুলো ঠিকই আছে। কথা শুনে হাসে হালিমা। বলেন– মিনা আগামীকাল আসবে। ও চিনতে পারবে না। ওর বয়স ছিল আট বছর। মোহসিন বলে– তোমাকে চিনতে পারবে তো?

পারবে।

তুমি চিনতে পারবে?

না চেনার কি আছে?

সেটা দেখা হলে জানতে পারবে।

তার মানে কি?

ষোল বছরে একজন মানুষ একইরকম থাকবে সেটা কি করে ভাবতে পারলে?

তার মানে?

মানে আবার কি? তোমার হিরো বাড়িতে ফিরছে। নিজের চোখে দেখ।

ঠিক দশটায় বাড়িতে প্রবেশ করেন মনজুর হোসেন। একরাশ বাক্স পোটলার সঙ্গে। 'বায়াতে মনজুর' নামের বাড়ির নামটা বার বার দেখেন। বলেন– কে লাগাল এটা?

আমি আব্বা। মোহসিন বলে। বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে চাপকলের পাশে নতুন বাথরুম। বারান্দায় বসে আছে হালিমা। এই নারীকে কি রেখে গিয়েছিলেন তিনি? মাথার চুল পাকা। গালটা তোবড়ানো। শরীর কেমন জীর্ণ-শীর্ণ। যার স্বামী বিশ বিঘা জমি করেছে, মাসে দশ হাজার করে টাকা পাঠায় তার স্ত্রী এত শীর্ণ আর মলিন হয় কি করে? আর হালিমা তাকিয়ে দেখে– একজন বুড়ো মানুষ। দাড়ি লম্বা। শরীর শুকনো। মাথার চুল সাদা-পাকা। সামনের একটা দাঁত নেই। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। দীর্ঘ দিনের বিল্ডিংসাইট তার হাতে-পায়ে এনেছে অযাচিত রুক্ষতা। এছাড়া একটা বড় শক্ত লাঠি ভর করে ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। এইটাই কারণ বাড়িতে ফিরে আসবার। দুই পায়ে বাত নিয়ে একজন মানুষ দুবাইয়ের দালানবাড়ি বানানোর কাজ করে কেমন করে? মোহসিন জেনে গেছে। সে তাড়াতাড়ি একটা গদিমোড়া চেয়ার বাবার জন্য এনে দেয়।

কতগুলো ইলেকট্রিক জিনিসপত্র। টেলিভিশন। রেডিও। রাইস কুকার। বড় বড় বাক্সে কাপড়-চোপড়। হাতের ছোট ব্যাগে কিছু সোনাদানা। বড় বড় চারটে লেপ। চাদর। বালিশের কভার।

তোমার পায়ে বাত?

মনজুর হোসেন হাসে।

তুমি আমাকে বলনি তো?

তুমিও তো তোমার বাতের কথা বলনি।

এরপর দু'জন পাশাপাশি বসে থাকে। সকলে খাবার আনে। বিছানার চাদর বদলে দেয়। বাক্স থেকে ওষুধ বের করে। মালিশ বের করে। সারাদিন গ্রামের নানা সব মানুষ আসতে থাকে। মনজুর হোসেনের আনা খেজুর আর শুকনো মিষ্টি খেয়ে চলে যায়। কেউ তসবি পায় কেউ জায়নামাজ।

মনজুর আর হালিমার কথা আর তেমন জমে না। এতদিন পর কত কথা বলার ছিল এখন মনে হয় কথাগুলো কোথায় গেল। বলেন হালিমা– চোখের চশমার কথা তো বলনি?

এটা কী একটা বলার কথা হল?

সামনের একটা দাঁত পড়ে গেছে সে কথাও–

তুমিও তো বলনি তোমার মাথার সব চুল উঠে গেছে। হালিমা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দেয়। তার মাথা ঢাকবার একটা রুমাল ছিল তাড়াতাড়িতে সেটা পরতে ভুলে গেছেন। মনজুর স্ত্রীকে দেখে, তারপর নতুন পাকা বাথরুমের দিকে। দেয়ালের উপর কাচ বসানো। চোর যাতে না আসতে পারে তাই এমন করেছে ওরা। এরপর তাকায় সেই নিমগাছটার দিকে যেটা শাখাপ্রশাখায় এখন বিশাল। কয়েকটি কাক বসে আছে হাড়হাড্ডি খেতে। এ বাড়িতে আজ ভাল রান্না হয়েছে কেমন করে ওরা পেয়ে গেছে সে খবর।

অনেক রাতে ঘুমাতে আসে হালিমা। চার পাশে বস্তা বস্তা চাল। ডাকাতের ভয়ে চাল শোবার ঘরেই রাখে সবাই, গোলাঘরে নয়। নতুন বস্তার চালে ঘরের একপাশ পূর্ণ। খাটটা সেই সব বস্তার মধ্যে সুন্দর করে পাতা। নয়া ফুলফুল স্যাটিনের চাদরে ঘুমিয়ে আছে বাতগ্রস্ত মনজুর। নিজের পা দুটোও ফুলে গেছে। কোনমতে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। সারা শরীরে এই পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তি। চারপাশে চালের গন্ধ। মশারির ভেতরে দু'জন মানুষ কেউ কাউকে চেনে না। বাতের ভারে ক্লান্ত দুইজন।

হিসাবনিকাশ, টাকাপয়সা, বাড়ি জমি ভবিষ্যৎ করতে করতে কবে কখন যৌবন বিদায় নিয়ে চলে গেছে। চারপাশের ধানের গন্ধে আপাতত দু'জন ঘুমিয়ে। এক শরীর যৌবন বিক্রি করে কেনা ধান, কেনা সেই সুখ যার এখন আর কোন অর্থ হয় না। হাতের মুঠোর ভেতর থেকে ঝরে পড়েছে সময়। সে সময় আর ফিরে আসবে না। কী ভাবছে হালিমা?

ওদের আর কোনদিন ভাতের কষ্ট হবে না তারপরেও কী এত ভাবনা!

সালেহা চৌধুরী কথাসাহিত্যিক

ভ্রমণ

গান্ধীজীর দেশে আমরা

নওশাদ জামিল

কতকিছু দেখব, ভ্রমণ করব কত জায়গায়–সবার মধ্যেই ছিল টানটান উত্তেজনা। আবেগ ছিল যত, তারচেয়ে বেশি ছিল নতুন কিছু দেখার, শেখার রোমাঞ্চকর বাসনা। দুইচারজন নই; আমরা ৫০ জন তরুণ, ৫০ জন তরুণী– শুভেচ্ছা সফরে যাচ্ছি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতে। বিশাল এক দেশ ভারত, যেন মহাদেশ। আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনই সমৃদ্ধ তার সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতার নানা নিদর্শন যেমন আছে দেশটির নানা জায়গায়, তেমনই ছড়িয়ে প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন। ঘুরেফিরে আমরা দেখব দেশটির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নানা স্থাপনা, সৌজন্য সাক্ষাৎ করব ভারতের মহামান্য রাষ্টপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে। ফলে সবার মধ্যেই ছিল অন্যরকম শিহরণ।

বাংলাদেশের অকৃত্রিম এক বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু সরাসরি অংশগ্রহণ নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, দুই কোটি শরণার্থীর আশ্রয়সহ নানা ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের বিরল সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত।

ভারত ভ্রমণের জন্য একঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ-তরুণীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, বলা যায়, সেটাও দেশটির বন্ধুত্বের অপূর্ব নিদর্শন। বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে, দুই দেশের তারুণ্যের মেলবন্ধন মজবুত করতে ২০১২ সাল থেকে শুরু হয় ভিন্নধর্মী 'হান্ড্রেড-মেম্বার বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন প্রোগ্রাম'। সংস্কৃতি ও বন্ধুত্ব বিনিময়ের এ আয়োজনের জন্যই নির্বাচিত হই আমরা। ভারতের রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে, রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে ২০১৬ সালের ৪ থেকে ১১ ডিসেম্বর ভারতের দিল্লি, আগ্রা, গুজরাট, কলকাতাসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার বিরল এক সুযোগ পেলাম আমরা। বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ আনন্দঘন সফর।

আমাদের এ সফরে ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ১০০ যুবক-যুবতী। 'হানড্রেড মেম্বার বাংলাদেশি ইয়ুথ ডেলিগেশন ভিজিট টু ইন্ডিয়া ২০১৬' ছিল পঞ্চমবারের আয়োজন। আমরা ঘুরেফিরে দেখি

ভারতের তিন প্রান্তের চার রাজ্যের নানা স্থাপনা; পরিচিত হই সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভাসের সঙ্গে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘোরার পাশাপাশি আমরা কথা বলি সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও। কাছ থেকে দেখি ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি। দেখি মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত আশ্রম, তাঁর সমাধিসৌধ, তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে নির্মিত জাদুঘর। ইতিহাস ও সভ্যতার নানা নিদর্শন দেখার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরি বাংলাদেশের সংস্কৃতির নানা দিকও। ফলে আমাদের জন্য এ সফর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে এ ছিল এক অপূর্ব সুযোগ।

সফর শুরুর আগে দেড়মাস ধরে প্রস্তুতি চলে আমাদের। কত পরিকল্পনা–সবার মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস। আমি যদিও কয়েকবার ভারতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এত পুলকবোধ আগে হয়নি কখনো। কেন-না আমরা তো এবার রাষ্ট্রীয় অতিথি। বিভিন্ন গণমাধ্যমের তরুণ সাংবাদিক, কবি, লেখক, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিনয়শিল্পী, মডেল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নৃত্যশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, প্রকাশক, সমাজকর্মীসহ সম্ভাবনাময় নানা ক্যাটাগরির ১০০জন তরুণ-তরুণী। দলটির কারো কারো ছিল এটাই প্রথমবার বিদেশযাত্রা, প্রথম বিমানভ্রমণ, যার ফলে তাঁদের আনন্দও ছিল খুব। সফরের একজন প্রতিনিধি হিসেবে অন্যদের মত আমার মধ্যেও কাজ করছিল রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দিনটি ছিল ২০১৬ সালের ৪ ডিসেম্বর, রবিবার। ভোরের হালকা কুয়াশা পেরিয়ে সকাল ৭ টার দিকেই আমরা এলাম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এয়ারপোর্টে এসে দেখি– একে একে আসছেন সবাই। ততক্ষণে এয়ারপোর্টে যেন বসে গেছে আনন্দমেলা। পরিচয়পর্ব, ফটোসেশন চলল কিছুক্ষণ। ব্যাগ, লাগেজ নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা। তার আগেই এয়ারপোর্টে চলে আসেন সফরে আমাদের পথপ্রদর্শক ভারতীয় হাই কমিশনের সমন্বয়ক (গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি) কল্যাণকান্তি দাশ। সবাই এসেছি কিনা খোঁজখবর নিচ্ছিলেন ট্যুর লিডার মো. মহিউদ্দিন। ততক্ষণে এসে গেছেন অন্যরাও। তারপর বোর্ডিং পাস, ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে আমরা বসে আছি উড়াল দেওয়ার অপক্ষোয়।

সকাল ১১টার দিকে আমাদের বহনকারী জেট এয়ারওয়েজের একটি বিমান দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যদিও সকাল ১০টায় ফ্লাইট ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু কী এক জটিলতায় তা একঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য তাতে উপকারই ছিল, সবার সঙ্গে এক ফাঁকে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। যাত্রার শুরুতেই প্লেনের ভেতর খানিকটা আড্ডাও হয়ে গেল। বিশাল প্লেনের সব যাত্রী আমরাই। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন বিক্রম ওবেরয় ঘোষণা করেন– একটু পরই বিমান উড়বে দিল্লির উদ্দেশ্যে। জেট এয়ারের প্লেনে চেপে, কুয়াশা ও মেঘের রাজ্য পাড়ি দিয়ে–দুপুর দেড়টায় এলাম দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ফ্লাইট ১ ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় অরেঞ্জ ও আপেল জুস হযরত শাহজালাল টার্মিনালেই পরিবেশন করা হয়। পরে ওমলেট, চিকেন নাগেট, বানরুটি, পেঁপে, তরমুজ প্রভৃতি মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়। তাতে আমাদের সকালের নাস্তাও হয়ে যায়।

দিল্লিতে নেমে খানিকটা আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বের হই এয়ারপোর্ট থেকে। দুপুরের রোদে ঝলমল করছে দিল্লি। এয়ারপোর্টের সামনেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তিনটি সুদৃশ্য বাস। সিরিয়াল অনুসারে একে একে আমরা উঠে পড়ি নির্ধারিত বাসে। এয়ারপোর্ট থেকে খানিক এগোলেই রেড ফক্স হোটেল। এ হোটেলে আমরা সেরে নিই দুপুরের আহার। তারপরই মূলত শুরু হয় আমাদের দিল্লি ভ্রমণপর্ব।

দুপুরের খাবার শেষে উঠে পড়ি বাসে। সফরের প্রথম যাত্রা দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইনস্টিটিউটে। ভারতে অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর। দেশটির জাতীয় জাদুঘরও এটি। ইতিহাস ও সভ্যতা, প্রত্নসম্পদের বৃহৎ সমাহার। বিকালের ঝলমলে আলোয় আমরা এলাম জাদুঘর দেখতে। বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ ও নিদর্শন খুঁটিয়ে দেখার জন্য যত সময় দরকার, আমাদের সেই সময় নেই। যতক্ষণ সময় পেয়েছিলাম, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। থরে থরে সাজানো প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোর নিদর্শন, সাজানো প্রাচীন ভারতের নানা ঐতিহ্য। শুধু প্রাচীন ভারত নয়, জাদুঘরে আছে মুঘল, ব্রিটিশ আমলের অমূল্য সব সম্ভার।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরটিতে রয়েছে প্রাক-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য আলাদা বিভাগ। স্থাপত্যশিল্প, শিলালিপি, বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মের জন্য আলাদা ভাগ, এন্টিকস, জুয়েলারি, নৃতত্ত্ব, ব্রোঞ্জশিল্প, কাঠশিল্প, কয়েন প্রভৃতির আলাদা সংগ্রহশালা। আছে মুঘল, ব্রিটিশ শাসনামলের নিদর্শন নিয়ে আলাদা বিভাগ। সব মিলিয়ে প্রায় দুই লাখেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন নিয়ে বিশাল সংগ্রহশালা। অল্প সময়ে তা দেখা সম্ভব নয়, তাই আমাদের বিভিন্ন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোই দেখানো হল একঝলক।

জাদুঘরে ঢুকতেই স্বাগত জানাল দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজস্থানে পাওয়া বিদ্যাদেবী সরস্বতীর মূর্তি। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের জন্য তিনটি গ্রুপ করা হল, প্রতি গ্রুপে দেওয়া হল একজন করে গাইড। ইংরেজিভাষী গাইড ঘুরে ঘুরে দেখালেন জাদুঘরের নানা ঐশ্বর্যসম্ভার।

জাদুঘরে শুরতেই হরোপ্পা, মাহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন। প্রাচীন এ সভ্যতা যে সমৃদ্ধ ছিল, তার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে জাদুঘরে। মাটি খুঁড়ে হরপ্পা সভ্যতার সময় পাওয়া একটি কংকালও সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। রয়েছে একই সময়ের কিছু টেরাকোটা ও মৃৎশিল্প নিদর্শন। জাদুঘরে ১৭ হাজারের বেশি মিনিয়েচার আর্ট রয়েছে। অধিকাংশই মুঘল আমলের। আছে নানা শিল্পকর্ম। কিছু আছে তালপাতা, কাঠ, কাপড়, চামড়ার ওপর আঁকা শিল্পকর্ম। আছে মুঘল সম্রাটদের ব্যবহার করা নানা সামগ্রীসহ নানা নিদর্শন।

জাদুঘর দেখে বের হতেই বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ততক্ষণে দিল্লির রাজপথে জ্বলে উঠেছে নিয়ন আলো। রাতের বাহারি আলোয় ঝলমল করছে ইতিহাসখ্যাত দিল্লি। ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া গেট জাদুঘরের পাশেই। খানিকটা হেঁটেই আমরা এলাম ইন্ডিয়া গেট দেখতে। দূর থেকেই দেখছিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝলমল করছিল যুদ্ধস্মৃতির মিনার। ভারতে জাতীয় স্মৃতিসৌধও এটি।

প্রতিদিন লাখো পর্যটক ভিড় করেন ইন্ডিয়া গেট দেখতে। আমরা যখন এ স্থাপনার সামনে আসি, তখন চারদিকে গিজগিজে ভিড় পর্যটকদের। সারাদিন দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পদচারণায় মুখর এই এলাকা। বিকালবেলা যেন পর্যটকদের মেলা বসে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারানো ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদের স্মরণে নির্মিত হয় অপরূপ সৌধ। ব্রিটিশ আমলে ১৯২১ সালে শুরু হয় সৌধের নির্মাণ কাজ। পুরোপুরি নির্মাণ করতে ১০ বছর সময় লেগেছিল। উদ্বোধন করা হয় ১৯৩১ সালে। প্যারিসের আর্ক দে ত্রিম্ফের আদলে নির্মিত এই সৌধটির নকশা করেন স্যার এডউইন লুটিয়েনেস। প্রথমে এর নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া ওয়ার মনুমেন্ট'। পরে নামকরণ করা হয় ইন্ডিয়া গেট।

৪২ মিটার উঁচু গেটটি সত্যিই নান্দনিক। সন্ধ্যা গড়াতেই এই গেট অন্যরকম সুন্দর রূপ নিল। গ্রানাইট ও সাদা বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত গেটটি যেন জ্বলমল করছিল। নয়াদিল্লি প্রধান প্রতীক হয়ে ওঠা এই গেট একেক সময় একেক রূপ পায়। তবে সন্ধ্যায় যে অপরূপ হয়ে ওঠে তা টের পাওয়া গেল।

জাতীয় জাদুঘর দেখে, ইন্ডিয়া গেটের সৌন্দর্য উপভোগ করে আমরা বের হই দিল্লির মেট্রোরেল ভ্রমণে। দিল্লির আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে মেট্রোরেল। তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় প্রায় রাত ৮টা ছুঁইছুঁই। আমরা এলাম মেট্রোরেল দেখতে, ঘুরে বেড়াতে। পাতালপুরীর

ট্রেনে চেপে আমরা ছুটে চলি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে। বিকাল থেকে রাতঅব্দি দিল্লি পথে-প্রান্তরে ঘুরে আমরা এলাম হোটেলে। নয়াদিল্লির অভিজাত কূটনৈতিক পাড়া চাণক্যপুরীতে আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয় পাঁচতারা হোটেল দ্য অশোক।

দুই.

সফরের দ্বিতীয় দিন ছিল ৫ ডিসেম্বর, সোমবার। সারাদিন আমরা ঘুরে দেখি বেশকিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা। ঘুরেফিরে দেখি পুরাতন দিল্লির পথ ঘাট। সেদিন বিকালে ছিল রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। সবমিলিয়ে দ্বিতীয় দিনটিও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর।

প্রাতঃরাশের পর শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ পর্ব। শীতের সকালে আমরা আসি রাজঘাটে, মহাত্মাজীর সমাধিসৌধ দেখতে। ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্মরণে এখানে নির্মিত হয়েছে সৌধ। ১৯৪৮ সালে নথুরাম গডসের হাতে মারা যাওয়ার পর তাঁর শেষকৃত্য শেষে চিতাভস্ম এখানে রক্ষিত হয়।

চারদিকের সবুজ প্রাঙ্গণের মাঝে কালো মার্বেল পাথরে তৈরি হয়েছে সমাধি সৌধ। পবিত্রতার আবহ চারদিকে। এ সময় সৌধ সম্পর্কে আলোকপাত করেন আমাদের দলের চিফ কো-অর্ডিনেটর ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক ও তথ্য) রাজেশ উইকে। সদস্যদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

মূল সমাধিসৌধে কালো মার্বেল পাথরে মোড়া। সামনে পুবের দিকে লেখা গান্ধীর উক্তি 'হায় রাম'। যার বাংলা করা হয় 'ও ঈশ্বর'। এটাই ছিল গান্ধীজীর শেষ উক্তি। প্রতিদিন সকালে তাজা গোলাপ, গাঁদা, জবা, বেলী, শিউলিতে সাজিয়ে মহান এই নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গান্ধীজীর সমাধিসৌধ দেখে আমরা ঘুরেফিরে দেখি দিল্লির অন্যান্য স্থাপনাও। তারপর যাত্রা ছিল দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায়। কিন্তু বিধিবাম! সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে ভেতরে ঢোকা গেল না। আড়াইশো একরের বেশি জমির ওপর নির্মিত এই দুর্গ। আমরা সীমানা দেয়ালের বাইরে থেকে একঝলক দেখি মুঘলদের এই স্থাপনার সৌন্দর্য।

লালকেল্লা থেকে কিছুদূর এগোলে বিখ্যাত দিল্লি জামে মসজিদ। এই মসজিদটিও মুঘল আমলের। জানা যায়, ১৬৪৪ সালে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন সম্রাট শাহজাহান। লালকেল্লাও তাঁর নির্মিত স্থাপনা। মিনারের চূড়া থেকে দেখা যায় লালকেল্লাও। ভেতরে না ঢোকার আক্ষেপ কিছুটা হলেও দূর হল এই মিনারে উঠে লালকেল্লা দেখে। ১৩৫ ফুট উঁচু মিনার থেকে দেখা যায় দিল্লি শহরের সৌন্দর্যও।

জানা যায়, শাহজাহানের উজির সাদউল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে মসজিদটি নির্মিত হয়। ১৬৫৬ সালে উজবেকিস্তানের ইমাম বুখারি মসজিদটি উদ্বোধন করেন। মূল ভবনের সামনের চত্বরে রয়েছে ওজু করার খোলা জায়গা। মসজিদে মার্বেল ও লাল বেলে পাথরে কাজ সত্যি দেখার মত। সব মিলিয়ে দেখতে যেমন নান্দনিক, তেমনই নজরকাড়া এই ঐতিহাসিক মসজিদ।

মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন সব ধর্মের অনুসরারীরা। ঘুরে দেখতে পারেন নারীরাও। এই মসজিদে গম্বুজ রয়েছে তিনটি। মিনার দুটি। মিনারে ওঠা যায় ৩০ রুপির টিকিট কেটে। কেউ কেউ টিকেট কেটে উঠলেন ওই মিনারশীর্ষে, ঘুরে দেখলেন আশপাশের অপূর্ব সৌন্দর্য। পরে পুরনো দিল্লি ঘুরে, সেখানের একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার সেরে আমরা চলে আসি হোটেলে। বিকালে আমরা রওনা হব রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে বিকালেই আমরা প্রস্তুত। মেয়েরা পরেছেন শাড়ি, ছেলেরা স্যুট-টাই। সবার মধ্যে যেন খুশির ঝলক। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা হবে– সত্যিই তা বিরল সৌভাগ্যের বিষয়। সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় হোটেল দ্য অশোক থেকে আমাদের বহনকারী বাস ছুটে চলে রাইসিনা হিলের দিকে। সন্ধ্যার ঝলমল করছিল গোটা রাষ্ট্রপতি ভবন। কাছাকাছি আসতেই উঁকি দিচ্ছিল লালচে স্থাপনাগুলো, আমরা টের পাচ্ছিলাম উত্তেজনা।

নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে আমরা ঢুকি রাষ্ট্রপতি ভবনে। ভবনের সামনে সিঁড়িতে তখন লালগালিচা। চোখজুড়ানো স্থাপত্যকর্ম। ঐতিহাসিক দরবার হলে আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করব। দরবার হলটির চারটি বড় গম্বুজ নকশাকাটা, কারুকার্যময়। রাষ্ট্রপতির চেয়ারে পিছনে মখমল কাপড়ের ছাউনি। ঠিক পাশেই অশোকচক্র। চেয়ারের ডান-বামে দুইটি আয়না পদ্মপাতার আদলে। তার পাশে দুধারে মহাত্মা গান্ধীর বড় দুটি ছবি। সামনে আমাদের জন্য বসার চেয়ার। যথাসময়ে আমরা আসন গ্রহণ করি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই আমাদের পাশ দিয়ে লাল গালিচায় হেঁটে আসেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। বাঙালি জাতির কাছে তিনি এক গর্ব ও প্রেরণার নাম।

দরবার হলে প্রবেশের আগে আমরা একঝলক দেখে নিই রাষ্ট্রপতি ভবন। বিশাল অট্টালিকা নয়, তবু এক ঐতিহাসিক ভবন। বিশাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন এটি। রাষ্ট্রপতির বাসভবন ছাড়াও তাঁর কর্মস্থল, অতিথি কক্ষ, হলঘর, ফুলের বাগান, নিরাপত্তা কর্মীদের থাকার জায়গা, সংশিষ্ট নানা অফিস ও খোলা চত্বর মিলিয়ে প্রায় ৩২০ একর জমি নিয়ে এই স্থাপনা। ব্রিটশদের তৈরি এই ভবনের অন্যতম আকর্ষণ হল দরবার হল। দরবার হলেই বিশাল সিংহাসনে বসতেন ব্রিটিশ ভারতের অধিপতি। আজ সেখানে সিংহাসন নেই, ভারতবর্ষে তাদের শাসনও নেই। বর্তমানে কারুকার্যখচিত সোনারাঙা এক জাঁকজমকপূর্ণ চেয়ারে বসেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি ভবনের অন্যতম আভিজাত্য হলদেটে পাথরের ড্রইংরুম। এখানে মন্ত্রিসভা, স্পিকারসহ সাংবিধানিক মর্যাদাসম্পন্ন পদের ব্যক্তিরা শপথ নেন রাষ্ট্রপতির কাছে। দরবার হলের পাশেই আলো-ঝলমলে অশোক হল। কাঠের তৈরি এই মেঝেতেই বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেদিন দরবার হলে আয়োজন করা হয়েছে গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের প্রায় ১ ঘণ্টা সময় দেন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলেন, আমি বাংলাদেশের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা ভারতীয়দেরও সম্মান জানিয়েছে। আমরা ছিলাম একই দেশের অংশ। এখন দুটি স্বাধীন দেশ হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রাচীন আমল থেকে। দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে এগিয়ে নেবে তরুণরাই।

দুই দেশের অভিন্ন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে প্রণব মুখার্জি বলেন, রাষ্ট্রপতি ভবন ১৯৩১ সালে তৈরি। ১৯৪৭-এর আগ পর্যন্ত চারজন ব্রিটিশ ভাইসরয় থেকেছেন এই ভবনে। প্রায় দুশো বছর শাসন-শোষণের পর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন জওহরলাল নেহরুর কাছে এখানেই (নিজের চেয়ারের দিকে দেখিয়ে) ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি মমত্ব প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলা ভাষার সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমার দেশের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ২০ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলেন। এ সংখ্যাটা বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে শুধু ভাষাগত নয়, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ব্যাপক মিল রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন করিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীনও আমাদের জন্য সমান প্রাসঙ্গিক।

মুঘল শাসনামল, বাংলাদেশের বারো ভুঁইয়া, ঈশা খাঁ, সোনারগাঁও, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায় প্রমুখের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। জানান বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা।

জমকালো এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক ও তথ্য) রাজেশ উইকে ও প্রতিনিধিদলের সদস্য ইশরাত জাহান মুমু রাষ্ট্রপতিকে একটি পিতলের রিকশা ও একটি সম্মাননা স্মারক উপহার দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শ্রী বিজয় গয়াল, একই মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ কে দুবে প্রমুখ। তাতে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পূজা সেনগুপ্ত এবং ইশরাত পায়েল। পরে আমাদের জলখাবার দিয়ে আপ্যায়নৎ করা হয়।

• আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

নওশাদ জামিল তরুণ সাংবাদিক

অনুবাদ গল্প

বনফুল

অমৃতা প্রীতম

অঙ্গুরী আমার এক প্রতিবেশীর বুড়ো বয়সী চাকরের নবপরিণীতা তরুণী ভার্যা। সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী। পঞ্জাবের কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করলে তাকে দুহাজু বলা হয়ে থাকে। লোকটির দ্বিতীয় বিয়ে হলেও অঙ্গুরীর কিন্তু ওটাই প্রথম বিয়ে। এক বছর হল অঙ্গুরীর বিয়ে হয়েছে, তাই তাকে নববধূই বলতে হয়।

পাঁচ বছর আগে পার্বতীপ্রসাদের প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর সে তার স্ত্রীর শেষকৃত্য যথাযথ ধর্মীয় বিধানে সুসম্পন্ন করে। অঙ্গুরীর বাবা তার শেষকৃত্যে পার্বতীপ্রসাদের কাঁধের কাপড়ের ধরা কাঁধ থেকে নামিয়ে শুকিয়ে দিতে এগিয়ে আসে। তাদের বিশ্বাস, স্বামীর কাঁধের কাপড়ের ধরা মৃত স্ত্রীর অশ্রুবিন্দুতে ভেজা থাকে। যদি কোন অবিবাহিতা কন্যার পিতা শোকার্ত স্বামীর কাঁধের কাপড়ের ধরা শুকিয়ে দেয় তবে মৃত স্ত্রীর স্বামীকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করতে হয়। অঙ্গুরীর বাবা এই কাজটি সম্পন্ন করে

শোকার্ত করে শোকার্ত স্বামীটিকে বলল, 'তোমার মৃত স্ত্রীর পরিবর্তে আমার মেয়ে তোমাকে দিলাম। কারণ তোমার কাঁধের কাপড়ের ধরা আমি শুকিয়ে দিয়েছি। এখন আর তোমার কান্নাকাটি করার দরকার নেই।' কোন পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে তার পরিবর্তে এভাবেই পুরুষটির কপালে একজন তরুণীকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য ঘটে এদেশের গ্রাম্য রীতি অনুযায়ী।

পার্বতীপ্রসাদও তাদের সম্প্রদায়ের গ্রাম্য রীতি অনুযায়ী অঙ্গুরীকে বিয়ে করার অধিকার লাভ করে। এদিকে অঙ্গুরী কিশোরীমাত্র, তার উপর তার মা আর্থারাইটিসে শয্যাশায়ী, তাই অঙ্গুরীর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেরি হল। একে একে পাঁচ পাঁচটা বছর গড়িয়ে গেল। তারপর এক সময় পার্বতীপ্রসাদের সঙ্গে অঙ্গুরীর বিয়ে সুসম্পন্ন হল।

পার্বতীপ্রসাদ তার মালিককে বলল নতুন বউকে হয় তার মহলে নিয়ে আসতে হবে, নতুবা তাকে গ্রামে ফিরে গিয়ে নতুন বউয়ের সাথে ঘরসংসার করতে হবে। মালিক দু'জন মানুষকে খাবার দিতে রাজি না হওয়ায় পার্বতীপ্রসাদ চাকরবাকরদের কোয়াটারের একপাশের একটা রুমে অঙ্গুরীকে নিয়ে বসবাস করার প্রস্তাব মালিকের কাছে রাখল। অঙ্গুরী নিজেই নিজেদের রান্নাবান্না করে খাবে, এই কথায় মালিক রাজি হওয়ায় পার্বতীপ্রসাদ অঙ্গুরীকে শহরে নিয়ে এল।

কিছুদিন অঙ্গুরী তার মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢেকে চলাচল করতে লাগল। এমনকি সে মেয়েদের সামনেও তার মুখের ঘোমটা খোলে না। কিন্তু কয়েকদিন পর সে মুখের ঘোমটা খুলে পায়ের রূপোর মল বাজিয়ে চলাচল করতে লাগল। অঙ্গুরী কয়েকদিনের মধ্যেই সবার পরিচিত হয়ে উঠল। তাঁর পায়ের মলের রুনুঝুনু আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের খিলখিল হাসি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সে দিনের অধিকাংশ সময় কোয়াটারে থাকলেও তার হাসির খিলখিল শব্দের সঙ্গে পায়ের মলের রুনুঝুনু আওয়াজও শোনা যেতে লাগল।

'কী পরেছ, অঙ্গুরী?'

'পায়ে মল পরেছি।

'গোড়ালিতে?'

'রূপোর মল পরেছি।'

'বাজুতে ওটা কী?'

'বাজুবন্দ'

'কপালে ওটা কী?'

'আমরা এটাকে বলি টিকলি।'

'আজ কোমরে কিছু পরনি কেন?'

'ওহ! আমার কোমরবন্দ বেশ ভারী, তবুও কাল ওটা অবশ্যই পরব। আজ কিন্তু আমি শাড়ির উপরের জ্যাকেটটি পরিনি। ওটার চেইন কেটে গেছে। কাল বাজারে নিয়ে যেতে হবে। আমার একটা নোলকও আছে কিন্তু! খুব বড় তাই শাশুড়ির কাছে রেখে এসেছি।'

তারপর থেকে অঙ্গুরী তার রূপোর গয়নাগুলোর একেকটা একেকদিন পরে বেশ হাসিখুশিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ঋতু পরিবর্তনের পর অঙ্গুরীকে আরো সাজগোজ করে বেড়াতে দেখা গেল। ওদের কোয়াটারের পাশেই আমাদের বাসা। সে মাঝেমধ্যেই আমাদের বাসার ডানদিকের বড় নিমগাছটার নিচেয় এসে বসে। নিম গাছের পাশেই একটা পুরনো কুয়ো। কলোনির কেউই কুয়োর পানি ব্যবহার করে না। শুধুমাত্র রাস্তার কাজের শ্রমিকরা মাঝেমধ্যে ওটার পানি ব্যবহার করে।

'কী পড়ছো বিবিজী?'

একদিন আমি গাছটার নিচেয় বসে বই পড়ছিলাম। অঙ্গুরী ওখানে পৌঁছেই আমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কি বই পড়তে চাও?' আমি তাকে জিজ্ঞস করলাম।

'আমি পড়তে জানি না।'

'কেন? তুমি কি লেখাপড়া শেখনি?'

'না।'

'কেন?'

'মেয়েদের লেখাপড়া করা পাপ না!'

'পুরুষদের কি পাপ হয় না?'

'না, তাদের পাপ হয় না।'

'এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?'

'কে আর বলবে! আমি নিজেই জানি।'

'তবে কি আমি পড়াশোনা করে পাপ করেছি?'

'না। শহরের মেয়েদের পাপ হয় না।'

আমি তার কথা শুনে হেসে উঠলাম। আমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে সেও হেসে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম, সে যা শুনেছে আর শিখেছে সেটকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। আমি তাকে আর কিছু বললাম না। সে তার নিজের বিশ্বাস নিয়েই থাকুক, আমি মনে মনে বললাম।

আমি প্রায়ই তার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার রঙ কালো হলেও শরীরের গড়ন নিটোল। এক কথায়, তার অঙ্গসৌষ্ঠব অপূর্ব। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতাম। প্রায়ই তার পুরুষ্ট স্তনযুগল আর তার গোলগাল দুই বাহুর উপর আমার চোখ পড়ত। মোট কথা, গায়ের রঙ কালো হলেও তার চেহারাসুরত কিন্তু অপূর্ব! আমি তার স্বামী পার্বতীপ্রসাদকেও দেখেছি। সে খর্বাকৃতি। তার চেহারায় ঠ্যাংগাড়ে ধরনের ভাব। গায়ের চামড়া কোঁচকানো। তাদের উভয়ের চেহারা-স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সময় সময় আমার হাসি পেত। আমি তাকে তাদের গ্রাম, তার বাবামা, ভাইবোন আর সবুজ মাঠের কথা জিজ্ঞাস করতাম। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অঙ্গুরী, তোমাদের গ্রামের মেয়েদের বিয়েশাদী কীভাবে হয়?'

'মেয়ের বয়স পাঁচ-এ পড়তেই একজন পুরুষের পদযুগল পাবার জন্য পুজো করতে শুরু করে।'

'কেমন করে পদযুগলকে পুজো করতে হয়।'

'ওহ! এই কথা! কন্যা কিন্তু নিজে কোন পুরুষের পদযুগল বন্দনা করে না। কন্যার বাবাকে এই কাজ করতে হয়। মেয়ের বাবা এক সাজি ফুল আর কিছু টাকাকড়ি পুরুষটির পায়ের কাছে রাখে।'

'তার অর্থ, মেয়েকে যার হাতে তুলে দেবে মেয়ের বাবা তাকেই পুজো করে।'

'এমন কি বিয়ের আগে কনে নিজেও তার হবু বরের দেখা পায় না।'

'বিয়ের কনে বিয়ের আগে হবু বরের সাক্ষাত পায় না!'

'না।'

'কোন কনেই না?'

'তবে', অঙ্গুরী ইতস্তত করে এক সময় মুখ খোলে।

'যে মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করে তারাই শুধুমাত্র বিয়ের আগে হবু বরকে দেখতে পায়।'

'তোমাদের গ্রামের মেয়েরা কি প্রেমে পড়ে?'

'খুব অল্পস্বল্প মেয়েই প্রেমে পড়ে।'

'প্রেম করে বিয়ে করা কি পাপ?'

'অবশ্যই পাপ, জঘন্য পাপ।' অঙ্গুরী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

'কেন পাপ?'

'তবে শোন বিবিজী, ছেলেরা প্রেমের ফাঁদে ফেলার জন্য মেয়েদেরকে কিছু একটা খাওয়ায়।'

'কী খাওয়ায়?'

'বনফুল। মেয়েটিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে ছেলেটি মিষ্টি কিংবা পানের মধ্যে বনফুল পুরে খাইয়ে দেয়। তারপর থেকেই মেয়েটি ছেলেটির প্রেমে পড়ে যায়। সেই মেয়ে জগত সংসারের অন্য কোন ছেলেকে দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'সত্যি কথা!'

'আমি ব্যাপারটা জানি। আমি নিজের চোখে এটা ঘটতে দেখেছি।'

'তুমি কী দেখেছ?'

'আমার একজন সই আছে, সে আমার চেয়ে একটু লম্বা।'

'তারপর!'

'তারপর কী ঘটল শুনতে চাচ্ছেন তো বিবিজী? মেয়েটি ছেলেটিকে মন দিল, আর একদিন সে মেয়েটিকে নিয়ে শহরে পালিয়ে গেল।'

'তুমি তা কীভাবে জানলে যে তোমার সইকে বনফুল খাওয়ানো হয়েছিল?'

'ছেলেটি বনফুল বরফির ভিতরে পুরে আমার সইকে খাইয়েছিল। তা না হলে সে বাবা-মা আর বাড়িঘর ছেড়ে যায়! ছেলেটি হরহামেশাই আমার সইয়ের জন্য অনেক কিছুই নিয়ে আসত। একবার সে একটা শাড়ি, কাচের

চুড়ি, পুঁতির মালা আরো কত কী নিয়ে এল!'

'ওগুলো তো ছিল উপহার সামগ্রী। তুমি কেমন করে বুঝলে সে তোমার সইকে বনফুল খাইয়েছিল?'

'বনফুল না খাওয়ালে সে কি ছেলেটির প্রেমে পড়ত?'

'কাউকে ভাল লাগার জন্যেও তো কেউ কারো প্রেমে পড়তে পারেই।'

'না না, তা হতে পারে না। শুধু শুধু কেউ কারো প্রেমে পড়ে না।'

'তুমি কি সেই বনফুল দেখেছ?'

'না, আমি কখনো দেখিনি। ওটা অনেক দূরদেশ থেকে আনতে হয়। মিঠাই কিংবা পানের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। আমার ছোটকালেই মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে যে আমি যেন কারো কাছ থেকে কোন কিছু না খাই।'

'কোন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে মিঠাই না খেয়ে তুমি ভালই করেছিলে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না তোমার সই কেন বনফুল খেয়েছিল?'

'ওটা খাবার জন্য সইকে পাপের ফল ভোগ করতে হবে!' অঙ্গুরীর বিষণ্ন মুখ দেখে বোঝা গেল সে তার সইয়ের জন্য মর্মাহত।

অঙ্গুরী বলল, 'ছেলেটির জন্য আমার সইয়ের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। বেচারী কোথাকার! সই চুল আঁচড়াত না। মাঝরাতে সে জেগে উঠে গান গাইতে আরম্ভ করত।'

'সে কী গান গাইত?'

'তা আমি জানি না। যারাই বনফুলের স্বাদ পায় তারাই সারাক্ষণ গান গায়, আর মাঝেমাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করে।'

আমি তাকে আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্গুরীর মাঝে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। একদিন সে নীরবে নিম গাছের নিচেয় আমার পাশে বসল। আগে বিশ গজ দূর থেকে তার পায়ের মলের রুনুঝুনু আওয়াজ পাওয়া যেত, যা থেকে বোঝা যেত অঙ্গুরী আসছে। কিন্তু আজ সে এল নীরবে। বই থেকে মুখ তুলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী! অঙ্গুরী।'

'আমাকে নাম লেখা শিখিয়ে দাও।'

'তুমি কি কাউকে চিঠি লিখবে?' অঙ্গুরী আমার প্রশ্নের জবাব দিল না।

তার চোখদুটো উদাস। দুপুরবেলা আমি অঙ্গুরীকে নিম গাচের নিচেয় রেখে বাসায় গেলাম। সন্ধ্যার দিকে আমি বাসার ভিতর থেকে গাছটার নিচেয় এলাম। অঙ্গুরী তখনো নিম গাছের নিচেয় বসে আছে দেখে আমি হতবাক! তাকে মনমরা দেখাচ্ছিল। তার কণ্ঠ থেকে বিষণ্ন সুরের গান ভেসে এল। আমি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'আমার অঙ্গে পাথর জড়ানো, আমি এক অভাগী! কেউ কি আমার যৌবনে আসবে না...?' অঙ্গুরী আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে গান বন্ধ করল।

'তুমি তো সুন্দর গান কর, অঙ্গুরী!' আমি বুঝতে পারলাম এতক্ষণ সে কাঁদছিল, সে চোখের পানি মুছে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আমি গান জানি না।'

'না, তুমি গান জান!'

'তোমার সই গান গাইত?'

'আমি সইয়ের কাছ থেকে একটা গান শিখেছিলাম।'

'তাহলে আমাকে সেই গানটা গেয়ে শোনাও।' আমার অনুরোধে অঙ্গুরী গান ধরল।

'একটা বছরের চার মাস হিমেল, চার মাস গরম, আর চার মাস বর্ষা! আমার জীবনে সারাটা বছরই হিমশীতল আর বর্ষণসিক্ত...।'

অঙ্গুরী তার গানে ঋতুচক্রের বর্ণনা দিয়ে বারমাসী গান শোনাল। অঙ্গুরী তার গান থামিয়ে আমার মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি তার কাঁধের 'পর হাত রেখে জিজ্ঞেস করতে চাইলাম, 'বাছা! তুমি কি বনফুলের স্বাদ পেয়েছ?'

কিন্তু তাকে সে প্রশ্ন না করেই আমি তার কাঁধের 'পর হাত রেখে বললাম, 'তুমি কি খাবার খেয়েছ?'

'খাবার?' অঙ্গুরী অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। আমি অনুভব করলাম আমার হাতের নিচেয় তার শরীরটা কাঁপছে। সে যে গানটা গাইল তারই অনুরণন হচ্ছে তার শরীরে। বর্ষাদিনের মেঘের ঘনঘটা, গ্রীষ্মের ঝোড়ো হাওয়া আর শীতের হাড়কাঁপুনি যেন তার শরীরকে কাঁপিয়ে তুলছে।

আমি জানি পার্বতীপ্রসাদ মনিবের বাড়িতে যখন খাওয়াদাওয়া করে তখন অঙ্গুরী নিজের খাবার নিজেই রান্না করে খায়। আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কি কিছু রান্না করেছ?'

'না আমি এখনো রান্না করিনি।'

'সকালে কী রান্না করেছিলে, চা খেয়েছিলে?'

'চা! আজ দুধ নেই।'

'দুধ কিনতে পারনি?'

'না, আজ দুধ কিনতে পারিনি।'

'তুমি রোজ চা খাও না?'

'খাই।'

'তবে আজ কেন চা খাওনি?'

'রামতারা রোজ দুধ নিয়ে আসে...।'

রামতারা আমাদের কলোনির চৌকিদার। সবাই মিলেঝিলে তাকে বেতন দেওয়া হয়। সে সারারাত রাস্তাগুলোতে হাঁটাহাঁটি করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমার মনে পড়ল অঙ্গুরী এখানে আসার আগে রামতারা এক কাপ চায়ের জন্য এবাড়ি ওবাড়িতে ধরনা দিত। তারপর সে তার খাটিয়াটা কুয়োর পাশে রেখে তাতে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিত। অঙ্গুরী আসার পর থেকে সে গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনতে শুরু করে। অঙ্গুরী তার চুলার 'পর একটা চায়ের পাত্র বসায়, আর চুলাটা ঘিরে বসে সে নিজে, পার্বতীপ্রসাদ আর রামতারা। তারা চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম করে। আমার আরো মনে পড়ল রামতারা তিনদিন এখানে নেই, সে ছুটিতে নিজের গ্রামের বাড়ি গেছে। আমার ঠোঁট দুটিতে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আমি অঙ্গুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অঙ্গুরী! তুমি তিন দিন চা খাও না, তাই তো?'

সে জবাব না দিয়ে শুধুমাত্র মাথা নাড়াল।

'আজ তুমি কিছু খেয়েছ!'

এবারও তার মুখে কোন কথা নেই। মনে হল সে কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না। আমি রামতারার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলাম, সে সুদর্শন, টানাটানা দুটো চোখ। এক মোহনীয় দেহসৌষ্ঠব। সে কথা বলে মিষ্টি করে।

'অঙ্গুরী?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি গ্রামে গিয়ে বনফুল খেয়ে এসেছ, তাই না?'

আমার প্রশ্ন শুনে তার গাল আর ঠোঁট বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। এবার সে মুখ খুলল।

'ঈশ্বরের দোহাই ! আমি তার হাত থেকে মিঠাই কিংবা পান খাইনি। শুধুমাত্র চা ছাড়া, বনফুল কি চায়ের মধ্যে থাকতে পারে?'

অঙ্গুরী আর কিছু বলতে পারল না। তার কণ্ঠ কান্নার শব্দের মাঝে তলিয়ে গেল।

অনুবাদ মনোজিৎকুমার দাস

লেখক পরিচিতি

অমৃতা প্রীতম (১৯১৯ - ২০০৫) পঞ্জাবী তথা ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম মহিলা কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম *আজ আখ্যান ওয়ারিস শাহ নু*– যা পাঞ্জাবের লোককাহিনির উপর ভিত্তি করে লেখা। তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাসের নাম *পিঞ্জর*। নারীবাদী লেখক হিসেবে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কাব্য, উপন্যাস ছোটগল্পের রচয়িতা হিসেবে বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রন্থ ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি *সুনেহে* কাব্যগ্রন্থের জন্য *সাহিত্য আকাদমি* পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি একাধিক পুরস্কার লাভ করেন, এসবের মধ্যে *ভারতীয় জ্ঞানপীঠ* পুরস্কার অন্যতম। ভারত সরকার ১৯৬৯ সালে তাঁকে *পদ্মশ্রী* এবং ২০০৪ সালে *পদ্মবিভূষণ* পুরস্কার প্রদান করে। একই সালে তিনি ভারতীয় সাহিত্য আকাদমির ফেলো মনোনীত হন। পঞ্জাবী ভাষায় তাঁর লেখা গল্পের নিরুপমা দত্তের ইংরেজি ভাষান্তরিত 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার' থেকে বঙ্গানুবাদ এখানে পত্রস্থ হল। এক বৃদ্ধের তরুণীভার্যার মনোবিকলনের কাহিনি এ গল্পে বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে

মথুরানাথ কুণ্ডু

যোগই জীবন কিংবা যোগময় এ জীবন
আপাতত এ বিতর্ক ভুলে চল যোগে ও জীবনে।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বায়বীয় কঠিন তরলে
ফুলে-ফলে গাছের পাতায়, আকাশে ও অম্লজানে
পঞ্চভূতে যা আছে তা সমস্ত দেহ ভাণ্ডে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে
ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিমায়
তার অনুভবই যোগস্থিতিময় একমাত্র অনন্য সত্তায়।

যোগ মানে কর্মে কুশলতা, দেহ-মন-প্রাণের সমতা
চেতনার ঊর্ধ্বায়নে নির্বিকার পঞ্চক্লেশে তূরীয় বারতা
যোগ মানে দূরদৃষ্টি, আদিগন্ত প্রসারিত বন্ধনহীনতা
যোগ মানে একত্বের অনুভবে বহুভাব সম্পূর্ণ বিলীন।

যোগে হয় সুগঠিত দেহ মন, রোগ নিরাময়
যোগে হয় একাগ্রতা, আত্মবল ও বিশ্বপ্রেমে সমূহ বিজয়।

গর্ভে যোগেই থাকি, বৃদ্ধি পাই আসনে আসনে
ভূমিষ্ঠ হবার আগে অনায়াসে থাকি শীর্ষাসনে
আবাল্য আসনে বৃদ্ধি, বজ্রাসনে শক্ত হয় ক্ষুদ্র শিরদাঁড়া
প্রাকৃতিক যোগাসনে কালক্রমে শেষ হয় দেহ মন গড়া
অতঃপর শুরু হয় ভ্রষ্টযোগ জীবনের খেলা রোগে ও বিয়োগে
আমিত্বের আবরণে সংকুচিত, অসফল শোকার্ত জীবনে।

সব পাখি ঘরে এলে, সব গরু ফিরে এলে গোয়ালে গোয়ালে
আমরাও শুনি ডাক– ফিরে চল চিরন্তন অনন্তের কোলে
তখন সন্ধান করি কী উপায়ে, কোন পথে যোগ?

বিষ

নৃপেন চক্রবর্তী

শরীর ভরা জল, তবুও নদী কাঁদছিল,
জনমানুষের ফসল কোথায়– ধানের গোলা ভাসছিল।
দাওয়ায় বসে আদুল গায়ে ঘুম ভাঙ্গা চোখ পিচুটি,
আজ বাদে কাল নবান্ন, টের পেয়েছে শিশুটি।
ঘাস বিচুলি গোবর ছড়া উঠোন ভরা আল্পনা,
শেষ বিকেলে খবর এল ফন্দিবাজের জল্পনা
গোপন কথা ছড়িয়ে দিল বন্ধু বার্তা-বিশ্বাসে
বিষ ঢুকেছে মাটির বুকে বিষ ঢুকেছে নিঃশ্বাসে।

নৃপেন চক্রবর্তী
ভারতের কবি

হিমালয়ে সকাল

রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী

পাইনগাছ অনেকখানি ঝুঁকি
মাথায় নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে ওঠে
খাদের ধারে মেঘেরা দেয় উঁকি
রৌদ্র দেখে ধরতে ওই ছোটে।

অবস্থার দুর্বিপাকে রোদ
মেঘের শিরে অমনি এসে জোটে
আলোছায়ার যুদ্ধে শোধবোধ
অর্কিডের রাঙা মুকুল ফোটে।

তোমার হাতে জলের অঞ্জলি
রেখেছিলাম, কখন গেছে ঝরে
আপন মনে তোমার কথা বলি
চোখের কোল চোখের জলে ভরে।

অর্কিডের মঞ্জরীতে ফুল
আজকে দেখি তোমার মত হাসে
তোমার কথা নয় কখনো ভুল
স্মৃতির পটে রঙিন ছবি ভাসে।

রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী
ভারতের কবি

দৃশ্য নিয়ে

কাজল চক্রবর্তী

আঙুলে জড়িয়ে আছে অভ্যাসের সুতো
ইচ্ছেমত সে সুতোকে কমাই-বাড়াই
সকালকে ফিরিয়ে আনি বিকেলে
বিকেলকে সন্ধ্যায়...

মাথার ঠিক ওপরে মাঝখানে
যৌবনের সূর্য যেখানে নাচত অনায়াসে
চুলে গভীরতা ফাঁকা হচ্ছে
টের পাই আঙুলে...

অভ্যাসের সুতো নিয়ে আজকাল আর
সেভাবে খেলতে ইচ্ছে করে না
দুপেগে স্থরিব বাতিস্তম্ভ, সবুজ গাছ
শিয়রে টাঙিয়ে রাখা বাবা-মার ছবি
সবকিছু কালো রাস্তায় ঝরে পড়া ফুল
সুতো নয়, আজকাল দৃশ্য নিয়ে থাকি মশগুল...

কাজল চক্রবর্তী
ভারতের কবি

নববর্ষ

দুলাল সরকার

নববর্ষের এই শুদ্ধ ভোরে তোমাকে প্রণাম
কত নীরব আয়োজনে ঘর গোছানোর কাজে তুমি
চারিদিকের শুদ্ধ সমাহারে পূর্ণ করে তুলেছ তোমার হিরন্ময় অস্তিত্ব,

জানি সবার কাছে পৌঁছবে না তোমার এ নীরব বার্তাটি–
কোন যুদ্ধশিশু, কিংবা কোন দরিদ্র বস্তিবাসী
যার নুন আনতে পান্তা ফুরায় কোন আবেদন নেই
তোমার তাদের কাছে কোন শরীরি সম্পর্কে... কি ভাবে
অপসৃত অন্ধকার শেষে পুব আকাশের নিপাট
নিকানো পলাশ উঠোন, শস্যশীল পাথারের
ধানের আগায় বিন্দু বিন্দু শিশিরের ফোঁটা,
দূরে পাহাড়ের নৈঃশব্দ গ্রীবার নিবিড় উচ্চারণ
তার পাশে আমার দেখা এক বিস্ময়াবিষ্ট কিশোরী
দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে দেখেছে তোমাকে;

দেখছে তোমার সূর্যভূমির অরুণোদয় চিহ্নের গর্ভ পোশাক
লাল নীল শয্যার মুহুর্মুহু পরিবর্তনের মাঝে
এক হিরন্ময় সম্পর্ক... এক দিকে শান্ত নীল
সরোবরের বিশুদ্ধতায় ফুটে ওঠা তোমার ধ্যানস্থ পদ্মের উন্মেষ
আর গাছে গাছে কত পাখি... তাদের সুমিষ্ট আওয়াজ
মনের মাধুরী মিশিয়ে গানের পরে গান
তার মাঝে কত নাম না জানা ফুলের গন্ধে
ভোরের নিজস্ব ঘ্রাণে মনে হয়
এই পৃথিবী নামক গ্রহটির এই বিশেষ দিনে
আয়োজনের কোথাও কোন কমতি নেই;

সব আছির দেশে তোমার চারিদিকে সবুজে সবুজে
মমতায়,ঔজ্জ্বল্যে, ফুলে ফসলে, জাগরণে
প্রকৃতি আর মানুষের যৌথ সম্পর্কে
ভালবাসার গহীন স্পর্শে তুমি অজর, অমর এক
মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা...

রাজকীয়

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

এই নাও তোমার হাতে তুলে দিলাম
রাজ্যজয়ের ফরমান

এইবার ছুটিয়ে দাও, তোমার খ্যাতনামা ঘোড়া
আস্তাবলে দাঁড়িয়ে দেখে নিই, অভিজাত তালিম
তারপর তৈমুর লঙের মত রাজ্য ভেঙে ভেঙে
একদিন তামাম মসনদ

এই তো আমি, অসুস্থ সুলতান...
সমস্ত তোলপাড় সরিয়ে রেখে আবার
ঘুমিয়ে পড়েছি অপরূপ কবরের ভেতর

দ্যাখো, অদূরে বালিকা বিদ্যালয়ে একদল কিশোরী এঁকে যাচ্ছে,
আমার দুর্বোধ্য ইতিহাস

বিশ্বজিৎ মণ্ডল
ভারতের কবি

মেঘ

পৃথ্বীশ চক্রবর্তী

মাঠ বলে, ওহে মেঘ চেয়ে দেখ
দিন দিন কেন যেন রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যাচ্ছি আমি
ফেটে হচ্ছি চির চির, বেড়ে যাচ্ছে জলের তিয়াস
অনাবাদী হয়ে যাচ্ছে মাটি
বহুদিন পাইনি তো লাঙ্গলের ফলার আরাম
ভুলে যাচ্ছি একদম ফসল উৎপাদনের স্বাদ।

আকাশের বুক দিয়ে শাদা-কালো মেঘ
হেঁটে যেতে যেতে বলে, ও মাঠ বোলো না আর
ক'টা দিন একটু অপেক্ষা কর
তারপর বৃষ্টি হয়ে নেমে এসে ভাল করে ভেজাব তোমাকে
ঘুচিয়ে দেব জলের পিপাসা, মুছে দেব সকল ফাটল
চিন্তা কোরো না। কৃষক তোমাকে আবার
আগের মতই করবে আবাদ
সবুজে উঠবে ভরে তোমার শরীর।

শুভ্রনীল সাগরের তিনটি কবিতা

দূরের জনপদ

তোমার চোখে বড্ড ভিড়! তাই ওদিকে বিশেষ যাই না...

ইদানীং খুব বেশি বলতেও ইচ্ছা হয় না আমার। ধরে নেই, আমি 'আ' বলতেই তুমি বুঝে নেবে...

ফেরা

বৃষ্টির জল ঢুকে এল মনের অন্দরে। চোখ বোজো, এঁকে দেব অনিঃশেষ চিৎসাঁতার...

আমরা হাতমুড়ে বসতেই জল জমে গেল! টুংটাং, কাঁটাচামচে উঠে আসছে সন্ধ্যে। আরেকটি চামচে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছি রাত, আর ফট করে ঘোলা হচ্ছ তুমি...

তুমি, আমাদের কথা জান! জানতে, আমরা ঠিকই ভোর অব্দি বসে থাকব। কেবল আমাদের অলক্ষ্য ইচ্ছেগুলো ইলিশের আয়ুর মতন; তাকে জলের কাছে নিয়ে যাও...

পর সমাচার, এখানে বর্ষাকাল

পৃথিবীর পথে রয়ে গেছি এতকাল, জেগে। শরীরে অগুনতি চাঁদের ছায়া। হঠাৎ চোখ পড়লে তাঁতঘর ঠাহর হয়। আজ জল না মুছেই এসে পড়েছি। জলে পদ্ম থাকলে এভাবে ফিরিয়ে দিত কেউ? চোখে ভিড়, ঘুমের ভেতর সরে যাচ্ছে কাঁথা– তুই আর আগের মত নেই! আমি বিকল্প বৃষ্টির প্রস্তাব করি...

গেল আষাঢ়ে যে ডালে ছিল ফুল, আজ কেউ নেই সেখানে! অর্থ হয়, স্বীয় ঝোঁকে ফুটে ওঠে ফুল। আমার নিভৃত রাত্তির মেখে নিয়ে, ছিঁড়ে দেয় শাখার বন্ধন...

স্মরণ

জন্মশতবর্ষে কানন দেবী

তপন চক্রবর্তী

কানন দেবী তাঁর আত্মজীবনীমূলক সবারে নমি আমি গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘কে বাবা কে মা দিয়ে কী হবে! আমার কাননবালা পরিচয়ই যথেষ্ট।’ কাননবালার জন্ম ২২ এপ্রিল ১৯১৬। কারও কারও মতে ১৯১২। জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলা। তাঁর বয়ান মতে, যাঁকে তিনি বাবা বলে মনে করতেন তাঁর নাম রতনচন্দ্র দাস এবং যাঁকে মা ডাকতেন তাঁর নাম রাজবালা। মা-বাবার মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়েছিল কি-না তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল। হয়তো তাঁরা সহবাস করতেন। বিষয়টি রতন দাস মারা যাওয়ার পর কাননের কাছে স্পষ্ঠ হয়ে যায়।

মা নেই, বাবা নেই, স্থায়ী আশ্রয় নেই, ঠিকমত খাওয়া-পরা নেই, বাড়ি বাড়ি ঝিগিরি করে, এর-ওর করুণা ভিক্ষে করে সুদর্শনা এক বালিকার বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় অসাধারণ সফল অভিনয় ও হৃদয়হরা সুধাকণ্ঠের গান এবং অসংখ্য হিন্দি ও বাংলা ছবির প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হয়ে ওঠার কাহিনি রূপকথাকেও হার মানায়। কানন নামের সেই মেয়েটি অনমনীয় মনের জোর ও সাধনায় নিজেকে কানন থেকে কাননবালা এবং পরে ব্যক্তিত্বময়ী কানন দেবীতে পরিণত করেছিলেন।

তাঁর মেয়েবেলা সম্পর্কে নানা শোনা কথা জোড়া দিয়ে মেখলা সেনগুপ্ত তাঁর *কানন দেবী: দ্য ফার্স্ট সুপারস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিনেমায়* লিখেছেন যে, কাননকে প্রথম হাওড়ার এক গরীব পাড়ায় পাওয়া যায়। হাওড়ার এক কনভেন্ট স্কুলে ওর নাম লেখানো হয়েছিল। অর্থের অভাবে স্কুল ছাড়িয়ে আনা হয়। আর এক গল্পে আছে তাঁকে শিশুকালে ভাগলপুরে গঙ্গা তীরের রাজবাড়ি আদমপুরের পোস্তা বাগানবাড়িতে আনা হয়েছিল। সেই রাজবাড়ি স্বঘোষিত রাজা শীলচন্দ্র ব্যানার্জির বসতবাড়ি। শীলচন্দ্র ওকালতি করতেন। শিশুটিকে আনা হয়েছিল কলকাতার হাড়কাটা গলি থেকে। পাঁচ-ছয় বছরের শিশুটিকে কলকাতায় ফেরৎ পাঠানো হয় বায়োস্কোপে নেমে বা গান গেয়ে আহার যোগাড় করতে।

অপর এক জনশ্রুতি তাঁর পিতা দর্জির কাজ করতেন। মা বাঈজি। কোথাও বলা হচ্ছে ওকে কলকাতায় আনা হয় ওর গানের গলা শুনে, কিন্তু তাঁকে আহার যোগাতে হচ্ছিল বাড়ি বাড়ি ঝিগিরি করে। এই অবস্থায়ও সেই মেয়ে গান নাচে কখনো বিরাম দেননি। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে উপরোল্লেখিত সকল সম্ভাবনার যে কোনটি হতে পারে।

তবে একটি জনশ্রুতি কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম তিনি তাঁর পালক পিতা-মাতা রতন দাস ও রাজবালার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কানন তাঁর আত্মজীবনীতে ওঁদেরই মা-বাবা বলে উল্লেখ করেছেন। অমিয়া নামের এক দিদির কথাও বলেছেন। কিন্তু তিনি একবারও ইঙ্গিত দেননি যে জায়গাটা কোথায় বা সেখানে কোন ধরনের লোকেরা যাতায়াত করত। রাজবালা কাননকে রতনের জিম্মায় রেখে নানা ঠিকানায় যেতেন। ক্রমে রাজবালা কাননের মায়ের মর্যাদা অর্জন করেন।

রতনচন্দ্র দাস জুয়াড়ি ছিলেন। তাঁর সুরাপানের নেশাও ছিল। মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করতেন। একটি স্বর্ণের দোকানের মালিকও ছিলেন।

তিনি তাঁর ফিটন গাড়ি করে চলাফেরা করতেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হলে রাজবালার জীবনে হঠাৎ বিপর্যয় নেমে আসে। কারণ, রাজবালা তো রতনচন্দ্রের বৈধ স্ত্রী নন। রতনের সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয়রা গ্রাস করে।

রতন কাননকে দুটো বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছিলেন। এর একটি বই পড়া ও অন্যটি গান শেখা। কানন তখনও পড়তে শিখেননি। রতন বই কিনে এনে তাঁকে শোনাতেন। আর গান শোনানোর ব্যবস্থা করতেন। গল্প ও গান শুনে শুনে কাননের অভ্যেস হল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেচে গেয়ে নায়িকা সাজা।

বলেছিলাম রাজবালা রতনের সম্পত্তির বিন্দুমাত্রও পাননি, যেহেতু তিনি রতনের রক্ষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর গায়ের গয়না, ঘরের আসবাব বেঁচে 'বাবু'দের ধার মেটান। কাননকে স্কুল ছাড়িয়ে ধনীর ঘরে রান্না, ঘর ঝাড়পোছ, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়। পড়াশোনা, গান চুলোয় যায়। তাঁর একটুও ফুরসৎ নেই। খাওয়া জোটে একবেলা। তাও ভাতের সঙ্গে ডাটার সবজি, কচুঘেচু ইত্যাদি। খাটাখাটুনিতে রাজবালার শরীর ভেঙে পড়ে। কিন্তু তিনি কাননের শরীরের দিকে খুবই যত্নবান ছিলেন।

কানন স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন দুঃসহ পরিস্থিতিতে মা-মেয়ে একসময় চন্দননগরে এক অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছিলেন। তাঁরা যেদিন উঠলেন সেদিনই তাঁদের পরমাত্মীয় তাঁদের কাজের লোকদের বিদেয় করে দেন। কানন দেবী এই আত্মীয়ের নাম জানাননি। তাঁর লেখায় সেই বাড়িতে তাঁদের দিনরাত ঝিগিরির লোমহর্ষক করুণ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। কানন দেবীর পুত্রবধূর ধারণা সেই আত্মীয়া অমিয়া দিদিই হবেন।

অনেক লাঞ্ছনা সয়ে মা-মেয়ে সেখান থেকে হাওড়ার ঘোলাডাঙ্গার পল্লীতে ছোট এক ব্যবসায়ীর আড়তে মাথা গোঁজার ঠাঁই পান। সেই পল্লীতে কোন কোন ঘরের সামনে লেখা থাকত 'এটা গৃহস্থের বাড়ি'। পাশের বাড়িতেই হয়তো বারবনিতারা দেহ ব্যবসা করতেন। ঘোলাডাঙ্গা নিয়ে কানন দেবী লিখেছেন, 'চারপাশের পরিবেশে শ্বাস নিতে অসুবিধে হত।'

এর মধ্যেও কাননের বড় করে শ্বাস ফেলার সুযোগ এসেছিল। পাড়ার লিকলিকে চেহারার বিপত্নীক মধ্যবয়সি ভোলাদা সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। তিনি ভক্তি গীতিতে সুর ভাঁজলে কাননের মনোজগতে ঝড় উঠত। কানন তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। ভোলাবাবু তাঁকে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, কর্তাভজা, মীরা ও সুরদাসের ভজন, সংস্কৃত পাঠ, ব্রহ্মসঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান শেখাতেন।

একদিন সকালে দেখেন ভোলাদা নেই। নেই তো নেই-ই। কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেলেন কেউ বলতে পারল না। ভোলাদা আর কোনদিন ফিরে আসেননি। কাননের আবার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা।

এমন সময় কাননকে পরম আদরে টেনে নিলেন এক অতি দরদী কণ্ঠের গায়িকা আশ্চর্যময়ী দাসী। কাননদের বাড়ির পাশেই থাকতেন। মেয়েটির অপরূপ রূপ আর অপূর্ব কণ্ঠ তাঁকে মোহিত করে। নতুন নতুন রেকর্ড করা আশ্চর্যময়ী কাননকে গানের জগতে টানার জন্য তালিম দিতে শুরু করেন। কানন মন খারাপ হলেই আশ্চর্যময়ীর কাছে ছুটে যেতেন। এটিও জনশ্রুতি। কারণ কানন দেবী আত্মজীবনীতে এক মহিলা শিল্পীর কথা উল্লেখ করেছেন। কানন তাঁকে 'বৌদি' বলে ডাকতেন। এই বৌদিই কি আশ্চর্যময়ী দেবী? উত্তর কোনদিন পাওয়া যাবে মনে হয় না।

তুলসী ব্যানার্জি নামের তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী দশ বছরের এই বালিকাটিকে মদন থিয়েটার/ জ্যোতি স্টুডিওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কানন তুলসীবাবুকে কাকা বলে ডাকতেন। মদন থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ১৯২৬ সালে *জয়দেব* ছায়াছবিতে তাঁকে ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। এর পরের বছরই *শঙ্করাচার্য* ফিল্মে অভিনয় করে কানন যশ অর্জন করেন। তখন তিনি কাননবালা নামে পরিচিত হন।

১৯২৮-৩১ সাল পর্যন্ত কাননবালার হাতে কোন কাজ ছিল না। কিন্তু সংসার তো চালাতে হবে। তখন তিনি গানের রেওয়াজ করায় মেতে উঠেন। মডার্ন থিয়েটার্সের সুরকার হীরেন বসু এবং গীতিকার ধীরেন দাসের সঙ্গে গান রেকর্ড করার কাজ শুরু করেন। এই সময় তাঁর ভাগ্যাকাশে এক ধ্রুবতারার উদয় হয়। তিনি দ্রোহের কবি, প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কাননবালার সঙ্গে ১৯২৯ সালে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর (সংক্ষেপে এইচএমভি) সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত গড়ে উঠে। ১৯৩৩ সালে কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন বসু, ধীরেন দাস দল বেঁধে এইচএমভি ছেড়ে কলম্বিয়ায় যোগ দেন। কাননবালাও তাঁদের দলে ভেড়েন। পরে মেগাফোনের জে এন ঘোষ ওঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কাননবালা ১৯৪৮ সালে কলম্বিয়ায় ফের রেকর্ড করেন।

কাননবালার ফিল্মে ফিরে আসা জ্যোতিষ ব্যানার্জির হাত ধরে তাঁর ছবি *জোরবরাত*-এ। ভয়েস পরীক্ষা দিতে হবে শুনে কাননের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সারারাত প্রায় নিদ্রাহীন। গর্তে বসা লাল চোখ। জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ। টেকনিসিয়ানদের সঙ্গে কাননের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁদেরই মুন্সিয়ানায় কাননবালার মুশকিল আসান হয়। এরপর কাননের সঙ্গে চারটি ছবিতে অভিনয়ের চুক্তি হয়। *জোরবরাত*, *ঋষির প্রেম*, *বিষ্ণুমায়া* ও *প্রহ্লাদ*। ১৯২৬-১৯৩২ পর্যন্ত মদন থিয়েটারে তিনি *ঋষির প্রেম* (১৯৩১), *জোরবরাত* (১৯৩১), *বিষ্ণুমায়া* (১৯৩২) ও *প্রহ্লাদ* (১৯৩২) ফিল্মে অভিনয় করেন।

প্রহ্লাদ ও *জয়দেব* ছবিতে কাননকে নারী ও পুরুষ দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করানো হলে কানন জ্যোতিষবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁকে ছেলের রোলেও অভিনয় করে যেতে হবে কিনা? জ্যোতিষবাবু জবাবে বলেন যে, এমন ছেলে বা মেয়ে কোথায় পাব যে দুই ভূমিকাতে অভিনয় এবং সেই সঙ্গে গানও গাইতে পারে? তাহলে ছেলেমেয়ে জড়িয়ে আমিই প্রথম শিল্পী? জ্যোতিষ রায় সঙ্গে সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলে আশীর্বাদ করেন, 'চিরটা কাল তুই প্রথমই থাকিস, কানন।'

এরপর কাননের রূপবতী, মনমোহিনী যুবতী হয়ে ওঠা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়া। তখন তাঁর অপূর্ব চোখ ধাঁধানো তনুশ্রী। তাঁর গমনপথের ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপ ও অপাঙ্গে চাহনি দর্শকের হৃদ্‌মাঝারে তুফান তুলতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে গম্ভীর করুণ নয়নে জীবনের সকল ব্যথা-বেদনার অনিন্দ্য প্রকাশে সাবলীল অভিনয় সকল বয়সের মানুষের মনে তৃপ্তির পরশ দিয়ে চলেছে। তিনি সকলের প্রিয়, সকলের আরাধ্যা।

১৯৩৩-৩৫ একের পর এক দ্বিভাষিক ছবি *শ্রীগৌরাঙ্গ*, *মা*, *হরিভক্ত*, *কণ্ঠহার* ও *বাসবদত্ত* তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচয় এনে দেয়। দ্বিভাষিক *চার দরবেশ* ১৯৩৩ সালে ভারতের হিট ছবি। ১৯৩৫ সালে তাঁর সেরা অভিনয় *মানময়ী গার্লস স্কুল*-এ। পরের বছর *কৃষ্ণ-সুদামা*, *খুনি কৌন*, *কণ্ঠহার*-এর হিন্দি রূপান্তর এবং বাংলায় *বিষবৃক্ষ*-এ অসাধারণ অভিনয় তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপায় অভিষিক্ত করে।

এরপর কাননবালা ১৯৩৩-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রাধা ফিল্মে, ১৯৩৭-১৯৪১ সাল পর্যন্ত নিউ থিয়েটার ও ১৯৪২-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এমপি প্রোডাকশনে কাজ করেন। অবশেষে তিনি নিজেদের শ্রীমতী পিকচার্সে ১৯৪৯-১৯৬৫ পর্যন্ত অভিনয় করেন। প্রথম দিকে তাঁকে নির্বাক সিনেমায় অভিনয় করতে হয়। কারণ তখন এই দেশে সবাক সিনেমা চালু হয়নি। *জোরবরাত*, *মানময়ী গার্লস স্কুল*, *খুনি কৌন* ও *মা* (১৯৩৪) সবাক চিত্র।

তিনি অভিনেতা জ্যোতিষ ব্যানার্জির সঙ্গে জুটি বেঁধে *জয়দেব* (১৯২৬), *জোরবরাত* (১৯৩১), *বিষ্ণুমায়া* (১৯৩২), *কণ্ঠহার* (১৯৩৫) ও *মানময়ী গার্লস স্কুল* (১৯৩৫)-এ অভিনয় করেন। প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে *শ্রীগৌরাঙ্গ* (১৯৩৩), *চার দরবেশ* (১৯৩৩), *মা* (১৯৩৪) ও *হরিভক্ত* (১৯৩৪) ছবিতে অভিনয় করেন।

নিউ থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯৩৫ সালে *দেবদাস* ছবিতে তাঁর বিপরীতে পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করার অনুরোধ জানান। কাননেরও প্রবল ইচ্ছা ছিল। রাধা ফিল্মের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকা ও তাঁদের অসহযোগিতার কারণে কানন অভিনয় করতে পারেননি। বাকি জীবনে তিনি এ দুঃখ ভুলতে পারেননি।

বীরেন সরকারের নিউ থিয়েটার কাননবালাকে অসাধারণ সংগীতশিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ে কাননবালার ছবি মানে সিনেমা হলে টিকিটের জন্য মারমার কাটকাট। কাননবালা কোথাও যাওয়ার সময় তাঁর ভক্তরাই তাঁকে রক্ষার জন্য সবসময় চোখে চোখে রাখত।

কলকাতা নিউ থিয়েটারে থাকার সময়, ১৯৩৭ সালে তিনি প্রমথেশ বড়ুয়ার *মুক্তি* ছবিতে অসাধারণ অভিনয় ও সংগীতশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। *মুক্তি* ছাড়াও তিনি *বিদ্যাপতি*, *সাথী* (১৯৩৮), *স্ট্রিট সিঙ্গার* (১৯৩৮), *জওয়ানি কি রাত* (১৯৩৯), *অভিনেত্রী* (১৯৪০), *লগন* (১৯৪১), *পরিচয়* (১৯৪১) ও *জওয়াব* (১৯৪২) ছবিতে অভিনয় করেন। এই সময়ে কাননবালা কানন দেবীতে রূপান্তরিত হন।

কানন দেবী প্রবাদপ্রতিম সংগীতগুরু রায়চাঁদ বড়ালের সঙ্গ ও তালিম পেয়েছিলেন। কানন দেবী ও রায়চাঁদ বড়ালের সম্পর্ক নিয়েও একসময় গুঞ্জন উঠেছিল। বড়ালই কাননের হিন্দি উচ্চারণ শেখানো ও গানের শিক্ষক। তা ছাড়া রাইচাঁদ বড়াল বহু দ্রুপদী পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংগীতের সঙ্গেও তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কানন দেবী অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক, আলি আকবর খান, ধীরেন্দ্র মিত্র, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তীর কাছেও সংগীত শেখার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন।

আল্লা রাখা খানের কাছে কাননের তালিম শুরু ইমন কল্যাণ ও পূরবী রাগে। কিন্তু কানন বেহাগ রাগে আসতে রাগরঙ্গে পুরো নিমগ্ন হয়ে যান। শিল্পী নিজেই বলেছেন, 'ওই বেহাগ শিক্ষা ও গাওয়া এক মায়াময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল।' বেহাগ রাগে তাঁর মনে রঙ ধরেছিল। ওস্তাদও বলেছিলেন, 'ইয়ে রাগমে তুমহারি মিল হ্যায়।' খানসাহেব কাননকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতেন, 'বেটি আপ অচ্ছি তরহ রিয়াজ করো! দেখোগে সারি হিন্দুস্তানমেঁ কিতনি ইজ্জত হোগি, রাজা ওয়াজির তুমহে সালাম করেঙ্গে।'

রায়চাঁদ বড়াল দুই মহিলা শিল্পীর জন্য খুব গর্ব অনুভব করতেন। মুশতারি বাই ও কানন দেবী। মুশতারি প্রথম যেদিন কলকাতায় এলেন সেদিনই সন্ধেবেলায় তাঁর বাড়িতে মুশতারির গান অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এই প্রথম আউট ব্রডকাস্টিং করে শোনানো হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বসে মুশতারির গান শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ রায়বাবুকে ফোনে বলেন, 'ও রাই, এ কী গান শোনালে আজ। দেবীকে একবার চোখের দেখা দেখাও।' মুশতারি পরদিন ঠাকুরের জন্য বিশাল মালা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

বড়াল কাননকে দিয়ে বাংলা সিনেমায় লাইভ গান গাওয়ান। সঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়নি। তিনি ফার্স্ট টেকেই নিখুঁত সুরে অনায়াসে গান গেয়ে গেলেন। বড়ালের ভাষ্য অনুযায়ী সাইগল ও কানন ছাড়া এই দুঃসাধ্য সাধন আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

কানন দেবী বাংলা হিন্দিতে অভিনয় ও সব ধরনের সংগীত পরিবেশনে পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথ প্রমথেশ ও কাননের অভিনীত *মুক্তি* ছবিতে তাঁর গানের চিত্ররূপ অনুমোদন করলে সেই প্রথম গানটি ছিল কাননের– 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' বিশ্বকবির গান এই প্রথম রূপালি পর্দায় গাওয়া হল। *মুক্তি* ছবি দারুণ জনপ্রিয়তা পেলে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্তান রেকর্ডজে এসেছিলেন। সেখানেই কাননের সঙ্গে তাঁর দেখা।

পরিসংখ্যানবিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবিশ কানন দেবীকে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ হল কানন, তারকা অভিনেত্রী।' কানন প্রণাম করাতে রবীন্দ্রনাথ কাননের ঠোঁট ছুঁয়ে বলেছিলেন, 'কী সুন্দর মুখ তোমার! গান করো?'

এই ঘটনা বিদ্যাপতি ছবির সময়কার। কবির মনেই ছিল না এই মেয়েটিই তাঁর গান গেয়েছেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তখন কবিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ও তো আপনার গান গেয়েই বিখ্যাত।' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তাই? তাহলে একবার শান্তিনিকেতনে এসে গান শুনিয়ো আমাকে।' কানন দেবী শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সুযোগ পাননি।

কানন দেবী ভারতীয় চলচিত্রের অনেক চরিত্রাভিনেতা ও সংগীতজ্ঞের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুন্দন লাল সায়গল (কে এল সায়গল নামেই বেশি পরিচিত), পঙ্কজ মল্লিক, প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, অশোক কুমারসহ আরো অনেকে। একদিন সবার মুখে মুখে গুন গুন করে গাইতে শোনা যেত 'আমি বনফুল গো...', জনপ্রিয় হিন্দি গান 'দুনিয়া ইয়ে দুনিয়া...', 'হায় তুফান মেইল...' ইত্যাদিও মুখে মুখে ফিরত। কানন দেবী ১৯৪৯ সালে শ্রীমতী পিকচার্সে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলো বই অবলম্বনে ছবি করেন। এর প্রতিটি বই হিট করে। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

কানন দেবীর প্রথম বিয়ে হয়েছিল অশোক মৈত্রের সঙ্গে। অশোক মৈত্র ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপশালী নেতা ও কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ নীতিবাগিশ হেরম্ব মৈত্রর ছেলে। অশোক মৈত্র অক্সফোর্ড ফেরৎ।

ক্যাপ্টেন হরিদাস ভট্টাচার্য সুপুরুষ, উচ্চমনা, উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপালের এডিসি পদে নিয়োজিত ছিলেন। রাজ্যপালের এক অনুষ্ঠানে হরিদাস কানন দেবীকে দেখেন। পরে হরিদাসই রাজ্যভবনে এক অনুষ্ঠানে কানন দেবীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন। হরিদাস কানন দেবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ১৯৪৯ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

দেশে ফিরে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর সহকর্মী শিক্ষক ছিলেন বলরাজ সাহানি। অশোক মৈত্রের বোন রানীর বিয়ে হয়েছিল পরিসংখ্যানবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে।

ছবিতে কানন দেবীকে দেখার পর থেকে অশোক তাঁকে পাওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠেন। ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। এরপর তাঁদের মধ্যে গভীর প্রণয় সঞ্চারিত হয় এবং বাগদান হয়। কিন্তু প্রবল বাধা হেরম্ব মৈত্র। অজ্ঞাত কুলশীল এই মেয়েকে পুত্রবধূ করতে তিনি সম্মত নন। অশোকের মা কুসুমকুমারী দেবীর কাননকে খুব পছন্দ। রানী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গেও কাননের সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে হেরম্ব মৈত্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর কাননের সঙ্গে সেই বছরের ডিসেম্বরে অশোকের সঙ্গে কাননের বিয়ে হয়। অশোকের বয়স ছত্রিশ, আর কাননের পঁচিশ।

কানন দেবী আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি সামাজিক স্বীকৃতিকেই আমার প্রেমের মুকুট করতে চেয়েছিলাম। সেটা পেলামও। কারণ ও-ও বিয়ে চেয়েছিল।'

কাননের ভক্তদের আশংকা ছিল ১৯৩৯ সালের বিখ্যাত নায়িকা উমাশশী বিয়ে করে গান ও অভিনয় ছেড়েছিলেন। কানন দেবীও হয়তো তাই করবেন। কানন দেবী কিন্তু তা করেননি। করেননি বলে কি তাঁদের বিবাহিত জীবনে কালো মেঘের সঞ্চার হল! কানন দেবীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি অশোককে দেবতার মত পূজা করতেন। অশোক তাঁকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে কানন রূপ-রস-গন্ধের পরশলাভে ধন্য হয়েছেন। পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। জেনেছেন ভালবাসা কারে কয়। অভিনয়, গান কাননের প্রথম প্রেম। এই প্রেমকে পরিত্যাগ না করাতে কি অশোক বিবাগী হয়ে গেলেন! অথচ তাঁদের প্রেমের সাঁকোই তো ছিল অভিনয় ও গান।

বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৪৫ সালে প্রশান্ত ও রানী মহলানবিশের পরামর্শে কানন দেবী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন। অশোক মৈত্র কোর্টে হাজির হননি। একতরফা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পরও অশোক মৈত্রের মা কুসুমকুমারী দেবী, রানী ও প্রশান্ত মহলানবিশের সঙ্গে কানন দেবীর সম্পর্ক অটুট ছিল।

আশর্যের কথা, কানন দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে অশোক মৈত্রের নামও উল্লেখ করেননি!

ক্যাপ্টেন হরিদাস ভট্টাচার্য সুপুরুষ, উচ্চমনা, উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপালের এডিসি পদে নিয়োজিত ছিলেন। রাজ্যপালের এক অনুষ্ঠানে হরিদাস কানন দেবীকে দেখেন। পরে হরিদাসই রাজ্যভবনে এক অনুষ্ঠানে কানন দেবীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন। হরিদাস কানন দেবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ১৯৪৯ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

কানন দেবী আত্মজীবনীতে স্বীকার করেন যে, একজন জীবনসঙ্গীর কাছে যা কিছু তাঁর চাওয়ার ছিল, সবই পেয়েছিলেন হরিদাসের কাছে। হরিদাস কখনও কাননের অতীত নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেননি। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে অসবর্ণ বিবাহে প্রচণ্ড বাধা ছিল, সেখানে এঁদের বিয়ে তিন দিনও টিকবে কিনা সন্দেহ ছিল। হরিদাসের কথা ভেবে কাননের বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু হরিদাস সমাজকে তোয়াক্কাই করতেন না। উভয়ের মন ও মতের মিল ছিল অসাধারণ ভাল। মনের মিল, বাগানের নেশা ও ছবি প্রেম ওঁদের দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখে।

শ্রীমতী পিকচার্সের প্রযোজক কানন দেবী এবং পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য। এঁদের প্রথম হিট ছবি শরৎচন্দ্রের *মেজদিদি*। *মেজদিদির* সহ-পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য। প্রযোজক কানন দেবী। হরিদাস স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন *নববিধান* ও *দেবত্র*। *দেবত্র*তেই কেবল কানন, উত্তম ও সুচিত্রা এক সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। কানন দেবী প্রায় পঞ্চাশটি ছবিকে অভিনয় ও কণ্ঠ দিয়েছিলেন। ছবির জগৎ *আঁধারে আলো*, *রাজলক্ষ্মী* ও *শ্রীকান্ত*, *ইন্দ্রনাথ*, *শ্রীকান্ত* ও *অন্নদাদিদি*, *অভয়া* ও *শ্রীকান্ত* ও *শেষ অঙ্ক* ছবির জন্য কখনো হরিদাস ভট্টাচার্যকে ভুলবে না। আর কানন দেবীকে তো বাঙালি প্রেমে পড়ে, গাল-মন্দ করে, ভালবেসে, বুকের মণিকোটায় রেখে কাটিয়েছে যুগের পর যুগ।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে থাকতে না পারলেও কানন দেবী আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন, 'যখন হরিদাস ভট্টাচার্যকে বিয়ে করি তখন লোকের ধারণা ছিল এ বিয়ে পনেরো দিন টিকলে হয়। সেই বিয়েই তো চব্বিশ বছর টিকে গেল।' পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ১৯৭৭ সালে হরিদাস ও কানন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কানন দেবীকে প্রদত্ত ১৯৭৬ সালের *দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার* আনতে গিয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে হরিদাস একদিন তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তাঁদের ১ নম্বর রিজেন্ট রোডের বাড়ি ত্যাগ করেন।

কানন দেবী কলকাতায় তাঁদের সন্তান সিদ্ধার্থকে গড়ে তুলেন এবং মহিলা শিল্পী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য বয়স্ক মহিলা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। বিশেষ করে সিনেমা শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখা।

বিশ্বভারতী ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কানন দেবীকে সাম্মানিক ডিগ্রি প্রদান করেন। ভারত সরকার তাঁকে *পদ্মশ্রী* পুরস্কারে ভূষিত করেন। ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে ছাড়াও তিনি ১৯৪২ সালে *পরিচয়* ও ১৯৪৩ সালে *শেষ উত্তর* ছবিতে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য বেঙ্গলি ফিল্ম জার্নালিস্ট'স অ্যাসোশিয়েশন পুরস্কারে বৃত হন।

হরিদাস ভট্টাচার্যের চলে যাওয়ার দুই আড়াই বছর পর এই মহান অভিনেত্রী ১৯৯২ সালের ১৭ জুলাই কলকাতার বেল ভিউ ক্লিনিকে চুপি চুপি সবকিছুর মায়া কাটিয়ে চলে যান।

'আমি বনফুল' গেয়ে যে গায়িকা একদিন বাঙালি হৃদয়ে ঝড় তুলেছিলেন, তাঁকে তো প্রশ্ন করা যায় না, 'তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা?'

তপন চক্রবর্তী সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক

ছোটগল্প

আশীর্বাণী

কৌস্তুভ বসু

পথ চলতে চলতে অনেক মুখ চোখে পড়ে। মন কেবল ধরে রাখে কিছু কথা!

আমাদের রোজকার টক-ঝাল জীবনে, এবড়ো-খেবড়ো কথা দেয়া-নেয়ার ছলে নিজের খেয়ালে এমন কিছু জ্যামিতির জন্ম হয়, অভিধানে যার সঠিক কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। চেনা-অচেনার আলোছায়ায় রহস্যের ধূম্র আবর্তে কানামাছি খেলতে খেলতে সম্পর্কের বিন্দুগুলি কখন যে পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে, তার হদিস বোঝা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার!

আমাদের গল্পটাও অনেকটা এরকমই। ওকে একিদন সরাসরি জিগ্যেস করেই ফেললাম, আচ্ছা আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কী, বলেত পারিস?

ও প্রথমে কোন উত্তর দিল না। খানিক পরে ভেঙে ভেঙে বলল, জানি না। ওর কথায় একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব টের পেলাম, 'তবে আমারও মাঝে মাঝে ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে। যতবারই নিজেকে জিগ্যেস করেছি, প্রতিবারই ভেসে উঠেছে অভ্রর মুখ। বুঝেছি, যদি প্রেম, সে অভ্র। তাহলে তুই? উত্তর পাইনি; আবার কেন জানি তোর থেকে দূরেও সরে যেতে পারিনি।'

–আমারও একই দশা। তোর কথা উঠলে, মল্লিকা না থেকেও কিভাবে যেন আমাদের মাঝে ছায়া বিস্তার করে। ওর মুখটা মনে পড়লে মনটা আজও বড় তেতো হয়ে যায়। কলকাতা আর মল্লিকা আমার নিঃশ্বাস– ধুলোয় মিশে গিয়েছে। কিন্তু এরপরেও, তোর কথা জানতে, তোর গলা শুনতে বড্ড ইচ্ছে করে। কি জানি কেন! আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কি আছে, বলতে পারিস?

–উঁহু। শুধু জানি, এমন কিছু আছে যার কোন ডেফিনিসন নেই, বা কোন নেমেনক্লেচার।

–জানিস, লাস্ট বুধবার আমার কলেজের এক বন্ধু ওর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিল। আসার সময় ওরা কিছু ক্যালেন্ডুলা কিনে এনেছিল। আমাকে তো জানিসই ভীষণ অগোছালো। ঘরে সখ করে ফুলদানি রাখব এমন শৌখিনতা কোনিদনই নেই। তো ওর ফুলগুলো নিয়ে কি করি! একটা কাচের জাগে জল দিয়ে রেখে দিলাম। ফুলগুলো বেশ কিছুদিন আমার দু'কামরার বেয়াদব স্বর্গে শোভা বর্ধন করল। ধীরে ধীরে ওদের আয়ু ফুরিয়ে এল, শুকিয়ে নুইয়ে পড়ল। আজ সকালে ওদের ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কাচের জাগটার দিকে চোখ পড়ল। একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস রিয়ালাইজ করলাম। জাগটার কোনিদন ফুলদানি হবার কথা ছিল না। ক্যালেন্ডুলাগুলিও কখনও ভাবেনি জীবনের শেষ ক'টা দিন ওই জাগের জল খাবে। অথচ ঘটনাচক্রে ওদের মধ্যে কি অদ্ভুত একটা বন্ডিং তৈরি হল ভাব! আমাদের গল্পটাও বোধহয় ওই ক্যালেন্ডুলা আর কাচের জাগের মত।

আমার কথা শুনে ও হেসে উঠল, যা বলেছিস। একটু পরে হাসিটা কেমন মিইয়ে গেল; ওর গলায় ঈষৎ অন্যমনস্কতা টের পেলাম, লাইফটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছিল। ভীষণ প্যাচপ্যাচে, ফ্যাকাসে, ডাল। এরকম সময় তোর সঙ্গে আলাপ। তুই যেদিন প্রথম 'কলি' বলে ডাকলি, জানিস দেয়ার ওয়াজ সামিথং ভেরি স্পেশাল ইন ইওর ভয়েস!

– তাই বুঝি?

– হ্যাঁ রে! সন্ধেবেলা ঝড় উঠেছিল। তার সঙ্গে ঝমঝমিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। মাটির ভেজা দোয়াঁশ গন্ধটা হঠাৎ কেমন নস্টালজিক করে তুলেছিল। তোকে বলিনি, সেদিন নিজে থেকেই আচমকা চোখ দুটো বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছিল। অভ্রকে ফোন করেছিলাম। বহুদিন পর অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম দু'জনে। কথায় কথায় কখন যে অমিত আর লাবণ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম, দু'জনের কেউই টের পাইনি। চারপাশের ব্যাস্ত পৃথিবীটা এক নিমেষে অদ্ভুত এক প্যারাডাইস হয়ে উঠেছিল। নিছক কৌতূহলে অভ্রকে জিগ্যেস করেছিলাম, শিলং পাহাড়ে কখনও গেছিস? ও কি বলে জানিস, হ্যাঁ, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, চুপি চুপি চাদর জড়িয়ে চলে যাই, আকাশের সবথেকে উঁচু তারার সঙ্গে গল্প করব বলে।

– তাই! তুই কি বললি?

– আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। বললাম, তুই যখন তারাদের সঙ্গে গল্প করিস, আমি তখন পাহাড়ের কোলে ঘাপটি মেরে বসে থাকি, তোর থেকে ওদের খবর নেব বলে। দুজনেই হেসে ফেলেছিলাম। আমাদের কল্পকথা সেদিন বাঁধ মানছিল না। এতদিনের ধ্যাত্তেরিকা ক্লান্তির পরে দুই বন্ধুতে কল্পবিলাসী আলাপচারিতায় নিদারুণ মজে গিয়েছিলাম। ফোনটা রাখবার আগে ও আবৃত্তি করেছিল নিবারণ চক্রবর্তী, 'আমরা যাবো যেখানে কোনো যায়নি নেয়ে সাহস করি/ ডুবি যদি তো ডুবি না কেন... ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।' ওর কণ্ঠস্বরে সেদিন অনেকিদন পর পুরনো অভ্রকে পেয়েছিলাম। গলায় আমার রবি ঠাকুর ভর করেছিলেন, 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি, আমার মনের ভিতরে!' হ্যাঁ রে, তোর ঐ ডাকে সেদিন কি জাদুমন্ত্র ছিল, বলবি?

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'For we are bound where mariner has not yet dared to go, And we will risk the ship, ourselves and all.'

আর বেশি কথা হয়নি। ওর মা খেতে ডাকছিলেন। ফলে সেদিনকার মত আমাদের আলাপের ওখানেই ইতি।

দুই.

কলির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ইয়াহু মেসেঞ্জারে। আসল নাম অবশ্য অন্য একটা ছিল; কিন্তু ওর ভিতর কিভাবে যেন খুঁজে পেয়েছিলাম কলকাতা। অবচেতনে ওকে ডেকে ফেলেছিলুম, 'কলি'! প্রথম প্রথম 'হাই' 'হ্যালো'... স্বাভাবিক কথাবার্তা, মাঝে মাঝে একটু জড়তার আভাস, হোঁচট... ধীরে ধীরে কবে যে দু'জনে দু'জনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম, উভয়ের কাছেই অজানা! আমাদের মধ্যে রোজ যে কথা হত, তা নয়। সত্যি কথা বলতে, বুঝতেও পারতাম না, এটা কি কোন সম্পর্ক নাকি টুকরো টুকরো কিছু আলাপের কোলাজ। পরে অবশ্য অবসরে মুহূর্তগুলো জোড়া লাগিয়ে দেখেছি এলবামটা নিতান্ত নির্জীব নয়!

মল্লিকার সঙ্গে তখন সম্পর্ক কেটে গিয়েছে। সম্পর্ক ভাঙারই কথা ছিল। নিত্যদিনের ঝগড়া-বিবাদে খেয়াল করেছিলাম ভালবাসার তারটা নিতান্তই রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তবু সাত পাঁকে বাঁধার এতদিনের পরিকল্পনা, বাঙালির মন, ছেড়েও ছাড়তে চায় না। একদিন সুরটা খাদে নামতে নামতে কেমন বেসুরো হয়ে গিয়েছিল। এইরকম এক বিষণ্ন রাতে কলির সঙ্গে আমার আলাপ। ফলে যা হবার তাই হল। আর দশজন সন্দেহপ্রবণ মানুষের মত মল্লিকাও এমন রূপকথার জন্ম দিল, কলির প্রতি আকর্ষণে আমাদের এতদিনের গড়ে তোলা স্বপ্নের বুনিয়াদ ভেঙে গেল। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কি মানুষ বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়? যাই হোক, ওকে যেটা কখনই বুঝিয়ে উঠতে পারিনি, একটা দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ভিতরে যদি বিন্দুমাত্র প্রাণ বেঁচে থাকে তাহলে অন্য কোন অতিসংক্ষিপ্ত আলাপে তাতে ভাঙন ধরতে পারে না। আমাদের সম্পর্কটায় আর কিছু বেঁচে ছিল না বলেই ওতে দাড়ি পড়েছে।

আমাদের বিচ্ছেদে আমি যত না ভেঙে পড়েছিলুম, কলিও বুঝি কিছু কম কষ্ট পায়নি। সবথেকে যে বিষয়টা ওকে বেশি আঘাত দিয়েছিল, তা হল, আমাদের ভাঙনে নিতান্তই অসহায়ভাবে ও এসে পড়েছে দু'জনের মাঝে। আমার গায়ে যাতে মিথ্যে কালি না লাগে, সে জন্য মল্লিকার সঙ্গে নিজে কথা বলতে উদ্যোগী হয়েছিল। চেয়েছিল যাতে আমাদের সম্পর্কটা বেঁচে যায়। ও পারেনি। উপরন্তু অনেক কথা শুনেছিল মল্লিকার কাছে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার ওর প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এমন মেয়েও পৃথিবীতে আছে? নিজে অকারণ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জেনেও ইন্টারনেটের এক বন্ধু যাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, তার জন্য সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নিতান্ত সম্পর্কটা বাঁচানোর তাগিদে এমন আত্মনিবেদন, আমাকে ওর প্রতি আরও দুর্বল করে তুলেছিল। ভিতরে ভিতরে ওকে একটিবার চাক্ষুষ করার এক তীব্র বাসনা জন্মেছিল।

একদিন রাখঢাক না করে সোজা বলে ফেললাম, কলকাতা আসছি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, প্রথম প্রথম আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না, একে অপরকে কি বলে সম্বোধন করব, 'তুমি', না 'আপনি', না 'তুই'। আর যেহেতু অনেক দিনের অন্তরায়ে বাক্যালাপ হত, ফলে সম্বোধনটি ঠিক দানা বাঁধারও সুযোগ পেত না।

আমার প্রস্তাবে কলি পত্রপাঠ 'না' করে দিল। বলল, আমি চাই না আপনার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখতে।

আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, ঠিক আছে, রাখতে হবে না। শুধু একবার আপনাকে দেখতে চাই। আর কখনও বিরক্ত করব না। কথা দিলাম।

কিন্তু কেন, আমাকে দেখে আপনার কি হবে?

দেখুন আপনার কাছে বিষয়টা নিতান্তই মামুলি ঠেকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে একদমই নয়। আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। তাই একবার আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে কথা দিচ্ছি আর কখনও এমন বেয়াদব অনুরোধ করব না; আর আমার অন্য কোন অভিসন্ধিও নেই, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এই কথার পরে কলির পক্ষে নিতান্ত মুশিকল ছিল আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।

অতএব একদিন বিকেল চারটের সময় স্থির হল কফি হাউসের সামনে দেখা করব। তবে এর সঙ্গে অত্যন্ত সচেতনভাবে যোগ করল, আমি যেন ওর কলেজের সামনে না দাঁড়াই, কারণ ওর বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ দেখে ফেললে এক নতুন আষাঢ়ে গল্পের জন্ম হতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, ও তখন সিইউ-তে এম কম পড়ছে।

আমি আজ্ঞা পালন করলাম। দূর থেকে দেখলাম কফিহাউসের নিচের ফুটপাথে এক তরুণী গেরুয়া সালোয়ার কামিজে দাঁড়িয়ে। কাঁধে

একটা শান্তিনিকেতনী সাইডব্যাগ। চোখের তারায় খানিক চঞ্চলতা (পাছে চেনাজানা কেউ দেখে না ফেলে) ! ভিড়ে একমুহূর্ত দেখলে কেউ আলাদা করতে পারবে না। কোন অতিরিক্ত সাজ নেই। কপালে একটা ছোট কুমকুমের ফোঁটা। রঙটা চাপা। চোখে একটা রিমলেস চশমা চেহারায় আলতো গাম্ভীর্য এনেছে। ঘামে ঘাড়ের কাছটা একটু ভিজে, নাকের সামনেও জমে অল্প স্বেদবিন্দু। শান্ত চেহারা। সুন্দরী নয়, তবে সুন্দর।

কফিহাউসে দোতলায় উঠে কোণার দিকে একটা টেবিলে বসে প্রথমেই বললুম, দেখুন আলাপের পূর্বে আমাদের দু'জনের দূরত্বটা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

ও ঠিক বুঝল না। বলা ভাল, আমার কথায় কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেল। ওর মুখে প্রশ্নচিহ্ন দেখে বললুম, ঘাবড়ে যাবেন না। আসলে 'আপনি', 'তুমি', না 'তুই' কি বলে সম্বোধন হবে এইটা বোধহয় ঠিক হওয়া বিশেষ জরুরি।

ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেসে ফেলল, 'আপনি'টা বড্ড বাবা-বাবা টাইপ। 'তুমি'টাও বেশ গুরু গম্ভীর। 'তুই'টা দিব্য! বেশ কাছের।

– তথাস্তু! তাহলে আজ থেকে 'তুই'!

এই শুরু। আলাপচারিতা বিভিন্ন দিকে বাঁক নিল। কে বলবে জীবনে প্রথম দিন আমরা দু'জন দু'জনের সামনে বসে আছি।

মনে আছে, অনেক কথার ভিড়ে ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, সম্পর্ক মানে কি?

ও বলেছিল, একজনের আয়নায় একজনকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই একটা সুতোর মূল তাৎপর্য।

ওর কথা শুনতে শুনতে ভারি আশ্চর্য হয়ে উঠছিলাম। আজকের এই মল-মাল্টিপ্লেক্সের ঝাঁ চকচকে জগতে মানুষ এখনও জীবন নিয়ে এত ভাবে! কলির দার্শনিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

খুব বেশি সময় আমরা থাকিনি। ও স্যান্ডউইচ অর্ডার দিয়েছিল। বিল আসতেই দেখি ফস করে নিজের মানিব্যাগ খুলছে। আমি বললাম, একদম নয়। আমি দেবো টাকা।

ও কিছুতেই মানল না। চোখ পাকিয়ে বেল, আমার শহরে তুই এসেছিস। আজ আমি তোকে খাওয়াবো।

ওর কথায় দারুণ রাগ হল, তোর শহর মানে? কলকাতা আমারও শহর!

কলি খুনসুটি হেসে বলল, না তুই এখন দিল্লিবাসী।

হঠাৎ ওর মোবাইলটা বেজে উঠল, হ্যালো... হ্যাঁ... আমি আসছি... না না ক্লাস হেয় গেছে... তুই একটু বোস... আমি আসছি।

মোবাইলটা রেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, সরি রে, অভ্র এসেছে বাড়িতে। ওয়েট করছে। আমাকে এখন যেতে হবে।

আমি বললাম, নো প্রবলেম। আমাকেও উঠতে হবে। কিছু কেনাকাটা আছে। করে বাড়ি ফিরব।

আসার সময় বইয়ের স্টল থেকে কলির জন্য একটা কবিতার বই নিয়ে এসেছিলাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা। ওর দিকে এগিয়ে দিতেই, কলি আমাকে পুনরায় বিস্মিত করে আমার উপহার ফিরিয়ে দিল। বলল, এটা আমি নিতে পারব না রে। আমি তোর জন্য যা করেছি তা তো বন্ধুর কর্তব্য। এটা নিলে আমি অনেক ছোট হয়ে যাবো। আর এই বইটা অলরেডি আমার আছে। এক কাজ কর, তুই এটা নিয়ে যা, বাড়িতে গিয়ে পড়িস।

জীবনে প্রথম কেউ আমার দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দিল। বেশ আহতই হয়েছিলাম। আবার এটাও অনুভব করেছিলাম, এই কারেণই কলি হয়তো আর দশজনের থেকে আলাদা। ওর মধ্যে আশ্চর্য এক চারিত্রিক দৃঢ়তা আবিষ্কার করেছিলাম, ঠিক যেমন খুঁজে পাই আমার নিজের শহরে। বলাই বাহুল্য, এর পরে কলিকে আর কখনও কোন উপহারের কথা বলিনি।

ট্যাক্সি করে ফেরার পথে ফেলে আসা রুদ্ধশ্বাস পনেরো মিনিট রিওয়াইন্ড করছিলাম। জানলার পাশ দিয়ে এক এক করে পিছলে যাচ্ছিল ধমর্তলা, ময়দানের ঘাস, ভিক্টোরিয়া... নিজের খেয়ালেই ওর ফিরিয়ে দেওয়া কবিতার বইটা উল্টোলাম। প্রথম পাতায় অনেক ভেবে ওর জন্য লিখেছিলাম কিছু লাইন। ওগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। পাতাটা ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলাম জানলার বাইরে। জানি না আবার কবে দেখা হবে কলির সঙ্গে। আদৌ আর হবে তো?

তিন.

দৈনন্দিন কাজের স্রোতে আমরা দু'জনে যেন নিজেদের থেকে সরতে সরতে ক্রমশ পৃথিবীর দুই গোলার্ধে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। কলি আর আগের মত ইয়াহ্যুতে নিয়মিত নয়। ওর কেরিয়ারে খড়-বাঁশের নিষ্প্রাণ মেরুদণ্ডে মৃত্তিকার প্রলেপ রচনে নিদারুণ মগ্ন। গবেষণার পাহাড়-প্রমাণ কাজের চাপে আমিও হয়ে পড়েছিলুম দিশেহারা। অবশ্য তাই বলে একবারও যে আমাদের মধ্যে কথা হয়নি তা নয়। মাঝে একবার কি দু'বার মোবাইলে যোগাযোগ হয়েছিল, তবে সে সংক্ষিপ্ত ঝটিকা কথোপকথন বারান্দার এক কোণায় পরিত্যক্ত মানিপ্ল্যান্টের গোড়ায় ছ-সাত মাসে একবার নামকাওয়াস্তে যত্নসহকারে জল ঢালার মতই যান্ত্রিক। এমন আলাপচারিতায় একবার জেনেছিলুম ও কল্যাণীতে এম ফিল করছে। তারপর একদিন শুনলাম কলকাতার একটি কলেজে অল্প বেতনে চাকরিতে জয়েন করেছে। ব্যাস এইটুকুই। ক্যালেন্ডারের পাতা নিজের হিসেব মত উড়তে লাগল। চারপাশের পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি হল। সাদ্দামের ফাঁসি, ওবামার গর্জন, সরোজিনী নগর-কনট প্লেস-মুম্বইয়ে একের পর এক বিস্ফোরণ, নন্দীগ্রাম, সিংগুর ... নিউজপ্রিন্ট ও বোকাবাক্সে অনর্গল আসা-যাওয়া... আমরা দুই বন্ধু দেশের দুই প্রান্তে মজে রইলাম নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে। তিনটে বছর কেমন রুদ্ধশ্বাসে কেটে গেল, ঠাওরই করতে পারলুম না।

থিসিসের কাজ শেষ করে পুজোর সময় নিজের শহরে ফিরলাম। চার বছর পর পুজোয় ফের কলকাতায়। অদ্ভুত এক আনন্দ যেন আমায় আপাদমস্তক ঘিরে ছিল। দিল্লিতেও বেশ কিছু পকেটে যেমন সিআর পার্ক, কালিবাড়ি, পশ্চিম বিহার, আইএসবিটি অঞ্চলে ভাল পুজো হয়। কিন্তু কলকাতার মজাই আলাদা। ঢাকের তালে শহরের জরাজীর্ণ ট্রাম-লাইন, ঘাস-কাদা-ধুলো-হাত টানা রিক্সা-বাসগুলো যেন নতুন প্রাণ পায়, অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে খাটে শুয়ে একমনে মোবাইলে নেম-লিস্টে স্ক্রল ডাউন করতে করতে হঠাৎ নজর পড়ল 'কলি'। আপন খেয়ালে পাঠিয়ে দিলাম ছোট্ট এসএমএস... 'শহরে, ছুটিতে'।

উত্তর এল কয়েক মিনিট পর: ওয়াও, কত দিনের ছুটি?

– এক মাস। তোর কি খবর? বিয়ে করেছিস?

– হ্যাঁ, এখন হনিমুনে এসেছি। (সঙ্গে একটা স্মাইলি)

এসএমএস-টায় একমুহূর্ত থমকে গেলাম। কলির বিয়ে হয়ে গেল, একবার জানতেও পারলাম না! কেন জানি হঠাৎ কিছু খারাপ লাগা আগাছার মত ভিড় করল চারধারে। কিছু বললাম না। চুপ করে মোবাইলটা পাশে রেখে দিলাম। খানিক পর মোবাইলটা নড়ে উঠল: কি রে চুপ হয়ে গেলি?

– না... কনগ্র্যাটস...

– জিগ্যেস করলি না আমার হাজবেন্ডটি কেমন?

– নিশ্চয় ভালই হবে। ভাল থাকিস।

– হ্যাঁ রে দারুণ ভাল... হেব্বি হ্যান্ডসাম। তুর চিনিস।

– আমি চিনি? নিজের মনে ভাবার চেষ্টা করলাম। আকাশ-পাতাল... উঁহু কোন মুখই মনে পড়ল না। অভ্রকে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবু ঢিল ছুঁড়লাম আন্দাজে: অভ্র...

– নো... ঋত্বিক (সঙ্গে আবার একটা স্মাইলি)

– ঋত্বিক? এ নাম তো শুনিনি আগে! কি জানি, সম্পর্কগুলি অনেকটা পাথরকুচির মত। কখন কোথা দিয়ে যে গজিয়ে ওঠে বিধাতা-পুরুষই সে খবর রাখেন।

ও বোধহয় আমার ইতস্ততভাব টের পেয়েছিল। কিছু পরেই আর একটা এসএমএস: কি রে তুই ঋত্বিক রোশনকে চিনিস না? বুদ্ধু কোথাকার!

ফোন করলাম: মস্করা হচ্ছে?

কলি হাসল, সত্যি তুই এখনও সেই আগের মতই বোকা রইলি। বিয়ে করলে জানতে পারতি না?

– চারপাশে সকলেই তো বুদ্ধিমান। আমি না হয় বোকাই থাকলাম।

– খালি বাজে কথা। চল না একদিন দ্যাখা করি। চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

– কবে?

– তুই-ই বল

– পঞ্চমী... সকালবেলা।

– সকাল হবে না। কলেজে জরুরি কিছু কাজ আছে। একটু পরে, আই মিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ হতে পারে।

– ওকে, দেন সাড়ে এগারোটায় এক্সাইডের মোড়ে হলদিরামের সামনে ওয়েট করিস।

ফোন রেখে দিলাম। মনের ভিতর ভদ্ভুত এক আনন্দ হল। কতদিন পর আবার কলির সঙ্গে দ্যাখা হবে!

চার.

তিন বছরে একটু মোটাসোটা হয়েছে। কাজের চাপ স্পষ্ট চোখে-মুখে। পরিবর্তনের আর কোন চিহ্ন নেই। খবরের কাগজ-বোকাবাক্সের বকবকানিতে শহরে যতই রাজনৈতিক বদল আসুক, কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

ভিড়ে ঠাসা হলদিরামে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক কোণায় দু'জনে বসলাম মুখোমুখি। এতদিন পর কি বলব, কি বলব না ভাবতে ভাবতেই কিছুটা সময় হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল। এরপর কিছু রুটিনমাফিক প্রশ্ন, যেমন বিয়েবাড়িতে রাধাবল্লভি-ছোলার ডালের সঙ্গে ছোট ল্যাজ বেগুনী কিংবা ঝুরো আলুভাজা পরিচিত দৃশ্য... প্রথমে– কেমন আছিস, তারপর ধীরে ধীরে– তোর থিসিসের কাজ কেমন হল, কবে ডিগ্রি পাবি, এরপর কি করবি, দিল্লিতে এখন কেমন টেম্পারেচার, শেষে– তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস!

এর ফাঁকেই এসে গেল দু'গ্লাস রঙীন সরবৎ। বরফ ডোবা শীতল পানীয় স্ট্র বেয়ে মুখের ভিতর পথ ভুলে জিহ্বার ত্বকে ছড়িয়ে দিল কিছু মিষ্টি নেশা। কলিকে জিগ্যেস করলাম, অভ্রর খবর কি? প্রেমলীলা কেমন চলেছ?

ওর মুখে কেমন এক ক্লান্তি ফুটে উঠল, আর প্রেম... সম্পর্কগুলো আজকাল মাঝে মাঝে কেমন যেন কাচের দেয়াল মেন হয়। দেখতে পাই, কিন্তু ছুঁতে পাই না। এরপর একটু নিরবতা। ওর চোখ দুটোয় খেয়াল করলাম, কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছে, অভ্র অনেক বদলে গিয়েছে। আগে লিটারেচার নিয়ে কত কথা বলত, কত নির্ভেজাল আড্ডা হত আমাদের। এখন সময়ের বড় অভাব। যেটুকু কথা হয় প্রায় পুরোটার জুড়ে থাকে হয় টাকা, নয়তো টিউশন; না হলে কিভাবে ওয়েবকুটায় ওপরে ওঠা যায়।... জানিস, সাহিত্য ওর জীবন, কিন্তু জীবন কখনও সাহিত্য হতে পারেনি। মাঝে মাঝে ওকে ভারি অচেনা লাগে।

ওর কথায় একটা চাপা মেটে কষ্ট টের পেলাম।

ভরসা যোগাতে বললুম, এরকম ভাবিছস কেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর তো বদলায়। সাহিত্যের সঙ্গে বাঁচতে গেলে হয়তো এগুলিরও প্রয়োজন আছে।

– আমি ঠিক মানি না। ভাল থাকার সংজ্ঞা আমার কাছে ডিফারেন্ট জ্যোতির্ময়। অর্থের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝি, কিন্তু তা যেন কখনও মূল ভালবাসাকে অন্ধ করে না দেয়।

এর উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না। সত্যি কথা বলতে এই প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে তর্কে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কারণ বুঝতে পারিছলাম, যাই বলব সেটা বড় মেকি বা প্লাস্টিক ঠেকবে। মনে মনে ওর জীবনবোধ আর আমার দশর্ন যে মিলে গিয়েছে। দ্বন্দ্বে যাবো কী উপায়ে?

প্রসঙ্গ বদলাতে জিগ্যেস করলুম, সুচেতনা, সুনির্মল, অরুণ... ওরা কেমন আছে?

আমি যে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করছি কলি বুঝতে পেরেছিল। মৃদু হেসে বলল, সবাই ভাল আছে। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জি-টক, অর্কুটে কথা হয়। সুচেতনা কলকাতাতে আছে। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযোগ আছে। গত সপ্তাহে দেখা হয়েছিল স্প্ল্যানেডে, শ্রীলেদার্সের সামনে।

এতদিন পর দু'জনে কথা বলছি। টের পাচ্ছিলাম দু'জনের ভিতরেই একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এও বেশ বুঝতে পারিছলাম, আমাদের মাঝে কথাগুলোর মধ্যে যেন বেহালার কিছু আলতো সিম্ফনি লুকিয়ে আছে।

কথার টানে কলি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। শূন্য দৃষ্টিতে নিজের মনে বলল, জানিস বাইরের ঘরে অনেক বন্ধু, কিন্তু ভিতর ঘরে গুটিকতক।

ওর কথাগুলো আমার মনের নোনাবালিতে রেখে যায় কিছু অব্যক্ত নীল দ্রাঘিমা।

কলেজ স্ট্রিটে কিছু বই কেনার ছিল। কলিরও ওর কোন বন্ধুর জন্মদিনের গিফট কিনতে হবে। তাই বেশিক্ষণ আর থাকলাম না। হলদিরাম থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্র সদন স্টেশন থেকে মেট্রো ধরলাম। দিল্লির ঝাঁ চকচকে মেট্রোয় চড়ার পর কলকাতার পাতাল রেলে উঠলে মনে হয় রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নেমে ট্রামে বসেছি। মাথার উপর কোন আদিম কাল থেকে ঝুলমাখা জালের ফাঁকে ক্লান্তিহীন ছ্যাড়ছ্যাড় ঘুরে চলেছে চ্যাপ্টা পাখা। চারধারে ভাল করে তাকালে বেশ বোঝা যায় সপ্তাহে সত্যিসত্যি ক'টাদিন কামরাগুলি পরিষ্কার হয়! তবু ওই যে বলে ঐতিহ্য, বাঙালির সব ব্যাপারে রোমান্টিক নস্ট্যালিজক দাওয়াই, দেশের প্রথম পাতাল রেল, সেই ঢেকুর তুলেই নিজেকে ফাঁপা সান্ত্বনা দিয়ে দুই বন্ধু মিশে গেলাম শহুরে যাত্রীর ভিড়ে।

দিল্লি, মুম্বই কে কলকাতা কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ই-যুগে যান্ত্রিক আধুনিকতা সব মেট্রোপলিটনকে এক অক্ষরেখায় এনে দাঁড় করিয়েছে। কমিউনিস্টরা যতই ক্যালকাটাকে 'কোলকাতা' বানাক, নতুন প্রজন্মের উগ্র পাশ্চাত্য-প্রীতি ও বিলাতি ভাষার কলকলানিতে আদি অকৃত্রিম মোচার ঘন্টর পরিবর্তে বাঙালি পাচক ফাটকাবাজি পাঁচমিশেলী ছেঁচকিতে বেশি আনন্দ পায়। ভিড়ের মধ্যে আমরা কোনমতে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনের সিটে এক বাইশ-তেইশ তন্বী সমবয়সী এক যুবকের সঙ্গে হাসির ফোয়ারায় ভিজে। মেয়েটির পোশাক দেখলে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হবে। উদ্ধত কুচযুগল ফিনফিনে টি-সার্টের বাঁধন মুক্ত হতে আকুলি-বিকুলি করে। তার উপর নির্লজ্জ এডভার্টাইজেমন্ট: ইফ ইউ ক্যান, ক্যাচ মি। ছেলেটি হাবে ভাবে একেবারে জন এব্রাহাম, থুতনির কাছে কিছু কালচি দাড়ি। গোটা কামরাটা মোটামুটি একটা মিনি মুড়ির বাক্স। তার মধ্যেই ইয়াং বেঙ্গল হাহা-হিহি, আমি-তুমি, তুমি-আমি, অভিষেক- ঐশ্বর্য, মোবাইলে শরীরী ছবি, টুকরো টুকরো নীল এসএমএসে মজে। মধ্যে থেকে পক্কেশের ভিড়ে সিপিএম-তৃণমূল তোলপাড়, কেউ আবার বিচ্ছিহ পারিবারিক, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক আলোচনায় মগ্ন। সব মিলিয়ে মেট্রোর কামরা এক জগাখিচুড়ি অর্কেস্ট্রার প্যাকেজ।

সামনের মেয়েটির দিকে নির্লজ্জ তাকিয়ে আছি দেখে কলি হাতে চিমটি কেটে গলা নামিয়ে বলল, কি রে ওরকম প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে কি দেখছিস?

নব্য কলকাতাকে। কল্লোলিনী শাড়ি-সালোয়ার ছেড়ে খোলা বুকে তিলোত্তমা হতে চায়!

ও হেসে ফেলল, অসভ্য কোথাকার!

সেন্ট্রাল এভিন্যু-এ নেমে পাবিলক হেলথ এন্ড হাইজিনের পাশের গলিতে ঢুকতে কে যেন ফিসফিস করে আমার কানের কাছে জিগ্যেস করল, এত বছর কোথায় ছিলি জ্যোতি?

নিজের ভিতর চমকে উঠলাম।

কি রে, কি হল?

না... কিছু না... এই পাড়ায় এলে শহরটা মনে হয় কেমন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে!

যা বলেছিস! আমার তো একেক সময় মনে হয় শহরটার হৃৎপিণ্ড কেউ এখানে পুঁতে দিয়েছে।

আইআইএসডব্লিউএম-এর সামনে দিয়ে যেতে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। মল্লিকা এখানে পড়ত। এক সময় ওর সঙ্গে দ্যাখা করতে এদিকে অনেক এসেছি। আমাদের অনেক হাসি-কান্না-রাগ-অভিমানের সাক্ষী এই বিল্ডিং, সামনের অজর-অক্ষয় কালো পিচ, রাস্তার ধারে স্ট্রিট ল্যাম্প।

কি রে, কি দেখছিস?

কিছু না... জাস্ট কিছু ফ্ল্যাশব্যাক...

কলি এগিয়ে এল কাছে। আলতো জিগ্যাসা, মল্লিকার সঙ্গে এর মধ্যে কোন কনট্রাক্ট হয়েছে?

মাথা নাড়লাম ধীরে... ও হারিয়ে গিয়েছ... সি ইজ লস্ট...

শেষ তিনটি শব্দ যেন নিজেকেই বেশি বোঝাতে চাইলাম। কিন্তু মন ভারি অবুঝ। একটা ক্লাস টু'র বাচ্চার মত চোখের পাতা দুটো আমার অজান্তেই তির তির করে কেঁপে উঠল। অন্যদিকে তাকালাম, চলি...

কাঁধে টের পেলাম কলির নরম আঙুল।

কলেজ স্ট্রিট পাড়াটা যেন ঈশ্বরের ল্যাবরেটরি। কয়েক পা হাঁটলেই মেলে এক এক আবিষ্কার। পুরনো বইয়ের হলদে গন্ধ, পুঁটিরাম-প্যারামাউন্ট কিংবা কলেজ স্কোয়ারের জলের ভাঁজগুলো যেন চুম্বকের মত টানে। আমার ক্ষ্যাপামো দেখে কলি ধরে রাখতে পারে না ওর হাসি। বলে, তোর বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমছে?

আমি বলি, উদো হয়ে গিয়েছি। এই পাড়ায় এলে আমার বয়স কমতে থাকে!

বায়ো না ত্যায়ো?

কম, আরও কম, আরও আরও... !

আমাদের হাসিতে কলেজ স্ট্রিটের হাড়-পাঁজর ভিজতে থাকে।

পুরনো কলকাতার ভিড়ে একসাথে চলতে চলতে এক সময় অবচেতনে দু'জনেই উপলব্ধি করি, জীবনের ছায়াপথে পরস্পর যত দূরেই বাস করি না কেন, যে অদৃশ্য নামহীন গ্রন্থিতে দু'জনে বাঁধা পড়েছি, তার জোর রোজকার নাম-জানা অনেক সম্পর্কের থেকে অধিক নিবিড়, ঘন ও আন্তরিক। মন তবু অবাধ্য। নিজের খেয়ালে প্রতিনিয়ত হাতড়ে খোঁজে পথের নাম।

পাঁচ.

আমরা ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। কথায় কথায় ওকে জিগ্যেস করলাম, কলেজে ক্লাসে ছেলেমেয়েরা তোকে বিরক্ত করে না?

ও বলল, না। বরং ঠিক উলটো। ওরা আমায় খুব ভালবাসে। আমার কী মনে হয় জানিস, ওরা বোধহয় আসলে বাইরের পৃথিবীটার সঙ্গে ঠিক যোগসূত্র খুঁজে পায় না। আমি ওদের সেই সেতুর সন্ধান দিই।

আমি কলির দিকে তাকালাম। ও তখন নস্ট্যালজিক। হারিয়ে গিয়েছে পুরনো দিনে। 'প্রথম যেদিন কলেজে গেলাম, হেডস্যার আমাকে ক্লাসে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার তখন সেদিকে মন নেই। হারিয়ে গেছি ওই ব্ল্যাক-বোর্ড, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চগুলোয়। জানিস, আগে কতদিন ভয়ে ভয়ে ডায়াসে উঠতাম, স্যারের টেবিলটা ছুঁতে আঙুল কাঁপত। সেদিন প্রথম ডায়াসে উঠে মনে হল, কলেজ লাইফের ক্ষ্যাপা স্বপ্নগুলো আজ যেন ডানা মেলে প্রজাপতি হয়ে উঠেছে!'

ওর চোখে মুখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি লক্ষ্য করলাম। স্বপ্নকে কাছে পাবার আনন্দ!

কিন্তু কলেজের পলিটিক্স...

একদম ভাল লাগে না। আমি আগে যে কলেজে ছিলাম ওখানে ভীষণ ছিল। কলেজ লাইফটা বাঁচিয়ে রাখতে ছ'মাসের মধ্যে চাকরিতে রেজিগ্‌নেসন দিলাম। দেখলাম ক্লাসরুমটাই ভাল, স্টাফ রুমটা বড্ড সাফোকেটিং! যাদের এতকাল শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি, তাদের মনে হল বড় বেশি করে 'মানুষ'।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়েছিলাম। একটা ট্রাম কালো পিচ চিরে ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে গেল। পিছনে এক দঙ্গল বাস, ট্যাক্সি ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে... এখানে কলকাতা জবরজং!

যান্ত্রিক মিছিলের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম, যেদিকেই তাকাবি, শুধুই 'মানুষে'র ভিড়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বার্থে সবাই দ্বন্দ্বে মেতে। অদ্ভুত এক সময়ের মধ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। চারপাশে শুধুই গুমোট।

যা বলেছিস। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা ভেন্টিলেসনের খুব প্রয়োজন। যে পথে এক চিলতে রোদ আসবে, একটু আলো, একটু বৃষ্টি।

আমরা সবাই সেই পথেই তাকিয়ে থাকি কলি। তুই যাদের একটু আগে 'মানুষ' বলে বেশি জোর দিলি, তারাও থাকে। আমরা শুধু বুঝতে পারি না। প্রত্যেকে নিজের মত করে দহনে পোড়ে। আর পুড়তে পুড়তে নিজের মত করে বৃষ্টির লোভে দিন গোনে। সেই দহনের যন্ত্রণা কেবল সেই বোঝে, আর কেউ নয়। সব যন্ত্রণার নাম থাকে না কলি।

ও এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ওর দৃষ্টিতে গভীরতা আছে, টের পাই।

একটা গিফটশপে ঢোকার মুখে একটা বাচ্চা ছেলে ওর সালোয়ারটা পিছন থেকে খামচে ধরল। ছেলেটার বয়স বড় জোর আট-নয় হবে। আদুর গা, পররন কেবল একটা হাফ প্যান্ট। শারদীয় মরসুমে ও ওর মত উৎসবে মেতে। কাল ইতস্ততভাবে মানিব্যাগ থেকে কিছু খুচরো দিয়ে ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ওর যন্ত্রণার নাম কি জানিস?

কলি তাকিয়ে থাকল নিরুত্তর।

আমি বললাম, কলকাতা!

গিফটশপ থেকে কিছু কেতাবি উপহার কিনে দু'জনে আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। ও একটা বাস ধরে হারিয়ে গেল। আমি পাতিরাম থেকে কয়েকটা লিটল ম্যাগ ব্যাগে পুরে ট্যাক্সি ধরলাম। মৌলালির মুখে মোবাইলটা নড়ে উঠল... এসএমএস, 'বাড়ি এসে গেছি। বেশ কাটল দিনটা। অনেক দিন পর তোর সাথে দেখা হয়ে বেশ লাগল কিন্তু।'

ছয়.

ছুটির মেয়াদ ধীরে ধীরে ফুরিয়ে বল। প্রায় একটা মাস শারদীয় কলকাতায় দিব্য কাটল!

ইচ্ছে ছিল, ফেরার আগে কলির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। জানি না, আবার কবে দেখা হবে! (আদৌ হবে তো?) এরপর ও সিঁথি রাঙিয়ে কোমর বেঁধে সংসারী হয়ে উঠবে, আমিও মিশে যাবো কাজের ক্ষ্যাপা স্রোতে। আমাদের বাইরের পথ যে আলাদা! কিন্তু মোবাইলে আবদারের আগে ভাবলাম, ও নিজে থেকে যেচে যে আড়াই ঘন্টা দিল, তার অকৃত্রিমতা বুঝি এই তাৎক্ষণিক চাহিদার চোরাবালিতে হারিয়ে যাবে। তার চেয়ে ওর এই উপহার মনের শীতলঘরে পেঁয়াজকলি হয়ে বেঁচে থাক। কাঙাল আমি ভিতরে, বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে কি লাভ?

রজনীগন্ধা শুকিয়ে যায়। বেঁচে থাকে ওর গন্ধ।

কলকাতা আমার রজনীগন্ধা। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন, আমার চারপাশে ওর গন্ধ জড়িয়ে থাকবে মাধবীলতার মত।

ফ্লাইটে উঠি, ফর্সা আকাশের দিকে তাকাই। কলকাতা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। এক সময় উড়ান ছাড়ে। জমি থেকে দূরত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়। জানলার কাচ দিয়ে দেখি, আমার প্রকাণ্ড শহরটা ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে একটা সময় হাতের তালুর সমান চেকার-বোর্ডে পরিণত হয়ে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে গেল। এরপর শুধুই আকাশ। সকালের ঘন দুগ্ধ ফেনিল মেঘগুলো জাপটে ধরল ইন্ডিগোর লৌহ শরীর, এঁকে দিল গত রাতের নরম বাসি চুম্বন। ওদের ভিড়ে মিশে যেতে যেতে আমিও ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলাম এক গভীর কুয়াশায়... নিজেদের অজান্তে কোন গ্রন্থিতে জড়িয়ে পড়লাম দু'জন? মনের অভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না সঠিক নাম। এক সময় মনে হল, এসব পার্থিব নামকরণের ভিতর ঢোকাই মূর্খতা। সংসারে এমন অনেক সূত্র ঈশ্বর রচনা করেন, যা আর দশটা পরিচিত দৈনন্দিন সম্পর্কের ভিড়ে হারিয়ে যাবার নয়, সংঘাতেও আসার নয়। আমাদের গল্পটাও এমনই এক দৈব-উপহার।

ঘরে ফিরে এসএমএস করলাম:

'ভালবাসা', 'বন্ধুতা' শব্দগুলো অনেক ব্যবহারে ক্লিশে, বড় ম্যাড়মেড়ে ঠেকে। বরং তুই আমার জীবনে এক আশীর্বাদ... অনেক ভেবে পথ, তাই তোর নাম রাখলাম, 'আশীর্বাণী'।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদিক থেকে উত্তর পেলাম। কোন কথা নেই। কেবল একটা স্মাইলি... একটা গোল মুখ হাসছে!

অনুভব করলাম, মন যখন শব্দ খুঁজে পায় না, তখন আলতামিরা অর্ধেক আকাশ।

কৌস্তভ বসু
ভারতের ছোটগল্পকার

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই- মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭।

এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

তর্পণ

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

পূর্ব প্রকাশিত-র পর

এরপর গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে নদীর ধারে এলাম আমরা সবাই। শতদল একটু দূরে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে এমন কায়দা করে পাথর ছুঁড়ছিল যে পাথরটা জলের মধ্যে দুতিনবার লাফিয়ে তারপর অন্তিম ডুব দিচ্ছিল। প্রত্যয় খানিকক্ষণ সেটা লক্ষ্য করে শতদলের সঙ্গে যোগ দিল। প্রবীর যথারীতি সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। অপর্ণা দত্ত মণিকা ও প্রথমা একটা গাছের শীর্ণ ছায়ায় কোনরকমে মাথটাা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি ভিড়ে গেলাম। ওরা ভদ্রতার হাসি হাসল। মণিকা বললেন– ভালুকপংয়ের নদী বেশি সুন্দর না দিরাংয়ের?

অপর্ণা দত্ত এই প্রথম কথা বললেন– একই নদী কিন্তু জায়গা বদল হলে চেহারাও কেমন বদলে যায়।

প্রথমা ছেলেমানুষ বলেই হয়তো হঠাৎ বলল– মলয় জেঠুকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলত ভালুকপং। মণিকা চকিতে একবার অপর্ণার মুখটা দেখে নিয়ে পরিবেশ স্বাভাবিক করবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন– কি করে জানলি?

– আসার সময় অত রাত পর্যন্ত ভালুকপংয়ে নদীর ধারে ছিল। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর লাগছিল। শায়ক কাকু কিন্তু বিশ্বাস করেনি। বাবাকে বলছিল মিথ্যে কথা। উনি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। অপর্ণার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মণিকা মেয়েকে চোখ দিয়ে নীরবে তিরস্কার করে কথা ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বললেন– সে সব জানি না মলয়দার মত এমন বউঅন্ত প্রাণ লোক কিন্তু আমি কমই দেখেছি।

এই সময় দূর থেকে প্রবীর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকায় আমি এদের থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। অপর্ণার প্রতিক্রিয়া দেখার একটু দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রবীরের ভঙ্গীতে এমন তাড়া ছিল যে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না।

প্রবীর বলল– শতদলদার আশঙ্কাই সত্যি হল। এই মাত্র পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা শুনলাম। অক্সিপেটাল বোনে প্রচণ্ড জোরে আচমকা আঘাতের ফলে মৃত্যু। বাকিগুলো ঘসটে যাওয়া এটসেটেরা। গোল ভারি কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। আশপাশের কোন বোন ড্যামেজ হয়নি। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলে যা ইনএভিটেবল। এতটা বলে প্রবীর আমার দিকে তাকিয়ে বলল– এখন কি কর্তব্য? আর তো ছদ্মবেশ পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

প্রত্যয় প্রায় শিখে ফেলেছে পাথর দিয়ে ব্যাণ্ডাজি। অরিন্দম শায়ক বলাকা জুতো মোজা খুলে তির তির করে বয়ে যাওয়া নদীজলে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেণুগোপাল লাঠিতে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে যতটা সম্ভব জলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শায়ক জলের মধ্যে বলাকার পছন্দসই পাথর খুঁজছে। দূরে গাড়ির কাছে জটলা করছে বিশ্বাস দীপক আর দাশগুপ্ত। অপর্ণারা তিনজন এখনও গাছের তলায়। আর সবাইকে ঘিরে আছে নীলে নীল এক আকাশ। ঘন সবুজ বন আর পাথরে পাথরে ঘুর্ণি তুলে বয়ে যাওয়া বন্ধু নদী। এই সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর খুনী। এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আপাত স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যেই লুকিয় থাকে কত অস্বাভাবিকতা। শায়ক ও বলাকাকে এখন দেখলে কেউ বলবে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়? জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে খুনসুটি করছে নবদম্পতির মত। তিক্ততার চিহ্নমাত্রও নেই। আর একটা জিনিসও আমরা তিনজনেই লক্ষ্য করেছি এই প্রেমিকযুগল অপর্ণাকে এড়িয়ে চলেন।

নদীর থেকে দূরে একটা কালভার্টের ওপর আমরা তিনজন এসে বসলাম। বাকি সবাই ভেতরে গেল। প্রবীরের কাছে সব শুনে শতদল মুখ দিয়ে শুধু হুম আওয়াজ করে নিস্তব্ধ বসে রইল। প্রবীর জিজ্ঞেস করল– হত্যাটা এস্ট্যাবলিশ হয়েছে। হত্যাকারীও যে এদের মধ্যেই একজন এ বিষয়ে তুমি কি শিওর?

– প্রথম থেকেই। বাইরের লোক করলে খুনটা অন্যভাবে হত। দশজনের মধ্যে থেকে সবার চোখ এড়িয়ে একটা লোককে এভাবে আলাদা করে ফেলা বাইরের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু... বলে শতদল আমাদের দিকে তাকালেও চারদিকের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করেই যেন বলল– কিন্তু মোটিভটা কি? এটা কি তাৎক্ষণিক না পূর্ব পরিকল্পিত?

তারপর অন্যমনস্কতা কাটিয়ে প্রবীরকে বলল– মুশকিল কি জান বিষ্ণুর দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তো কোন উপায় নেই। হয়তো কোন কিছু ওর চোখ এড়িয়ে যাবে হয়তো ও মনেই করবে না জরুরি অথচ সেইরকম সব তথ্যই অনেক সময়ে তদন্তের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। অনবরত ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফোনটা এখন থেকে আমার কাছেই থাক।

প্রবীর বলল– দাশগুপ্তকে আপনি সম্ভাব্য অপরাধীর তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন। মেয়েরাও বাদ কারণ যথেষ্ট গায়ের জোর লাগে এভাবে খুন করতে।

আমি প্রবীরকে চটাবার জন্যই নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলাম– কেন দাশগুপ্ত বাদ কেন?

– ওকে ধরতে পারলেই সবথেকে খুশি হতাম। লোকটার আর কোন দিকে মন নেই শুধু ফ্রেন্ডসের পেছনে লাগা ছাড়া। সারাক্ষণ তুলনা করছে ট্র্যাভেল ইন্ডিয়ার সঙ্গে। হোটেলের ঘর, খাওয়া, গাড়ি সব নিয়ে ঘ্যানঘ্যান। এমনকি রাণীক্ষেত যে অরুণাচলের থেকে সুন্দর লেগেছে সেটাও ফ্রেন্ডসের দোষ। খাবার নিয়ে যেভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিবেলায় গোলবাল বাধে ওকেই যদি বিশ্বাস খুন করে তো অবাক হব না।

সত্যি দাশগুপ্ত যেভাবে খাবার ঘরে চিৎকার চেঁচামেচি করেন মণিকা অপ্রস্তুত বোধ করলেও চুপ করে থাকেন, যেন শুনছেনই না। স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করা ওর সাধ্য নয়। প্রত্যয় প্রথমা খেতে না পারলেও জোর করে ঠেসে খাওয়ানোর চেষ্টা– পয়সা উশুল করবার এমন প্রাণপণ চেষ্টা দেখে সত্যি মনে হয় এ লোকের দ্বারা আর কিছু সম্ভব নয়।

প্রবীর বলল– শায়ক অরিন্দম আর বেণু-গোপালের ওপর নজরদারিটা তবে জোরদার করা দরকার।

এই সময় শায়ক ও বলাকা পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে এল। হাতে অচেনা একগাদা ফল। বলাকা খুশিতে ঝলমল করে বলল দেখুন কি মিষ্টি। আমরা নিচের গ্রামের বাজারে পেলাম।

হাতে চাপ দিয়ে ফাটিয়ে আধখানা খেয়ে দেখলাম কমলালেবু আর টমেটো মেশানো স্বাদ। দিব্যি খেতে। এরা নাম বলল– পার্সি মোন। শায়ক ষড়যন্ত্রকারীর ভঙ্গীতে বলল– বেণুদা আর বাগচীকেও বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে যেতে। বাগচীদার ইচ্ছেও ছিল কিন্তু বেণুদা গেল না বলে গেল না। সেই সকালের পর থেকে বেণুদা আমার সঙ্গে কথাই বলছে না। এই রকম লোকেদের দলের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়াই উচিত নয়।

শতদল গম্ভীর গলায় বলল আপনিও তো অপর্ণা দত্তর সঙ্গে কথা বলেন না।

শায়ক কি একটা বলতে গেল তার আগেই এ্যাপেল অর্চার্ডের দোকান থেকে স্কোয়াশ জ্যাম কিউয়ি কিনে সবাই খুশি মনে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এল। এমন কি অপর্ণাও দেখলাম মেয়ে ও নাতনীর জন্য এক ব্যাগ কিউয়ি কিনেছেন। আমাদের বললেন– দিল্লিতে একটা পঁচিশ টাকা আর এখানে এতগুলো সত্তর টাকা ভাবা যায়?

শখের কেনাকাটা মনের ভার লঘু করে শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম।

দিরাংয়ে দ্বিপ্রহর

দিরাংয়ের এই হোটেলটা বেশ বড় অতএব ঘরের

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোঁদের গল্প ও ছোঁগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠকসমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোঁ-বড় যে-কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোঁদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

তদন্তের এই পর্যায়ে শতদল নানারকম প্রশ্ন করে নিজের জিজ্ঞাসারই উত্তর খোঁজে। ডায়রিতে মলয় দত্তর পাশে চারটে নাম লেখা। শতদল নিজের মনেই বিড়বিড় করে পেশার দিক দিয়ে লেদার গুডস ব্যবসায়ী দিল্লির বাসিন্দা। তার সঙ্গে কলকাতার ডাক্তার– এমনিতেই চান্স নেই যদি না সেই ভুল চিকিৎসার কেসের সঙ্গে– নাঃ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

দরজা বন্ধ থাকলে কে যে কি করছে বোঝার উপায় নেই। দাশগুপ্তের তাড়নাতেই বোধহয় বিশ্বাস আজ খাওয়ার আয়োজন ভালই করেছিল। খাওয়ার পর শতদল বলল– চল পাহাড়ী রাস্তায় একটু হাঁটি। মাথার ভেতরটা জট পাকিয়ে আছে।

আমি একটু চটেই বললাম– আমাদের না বললেও তুমি তো উত্তর পেয়েই গেছ। কোথায় অসঙ্গতি তা যদি জান তাহলে আর কি বাকি থাকে?

– কি এর উত্তর পেলে বাকি থাকে কেন?

প্রবীর জিজ্ঞেস করল– আপনার কি মনে হয় আরও কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

– পারেই তো। পরিকল্পনা করে ঠাণ্ডা মাথায় যে একবার খুন করে সে আবারও করতে পারে।

– তবে আপনি আর কেন দেরি করছেন? খুন প্রমাণ হয়েছে। এখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে সরাসরি তদন্ত শুরু করে দেওয়াই তো ভাল।

– বিষ্ণুর ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছি দেখি যদি আর কোন নতুন তথ্য মেলে। একদম শিওর হতে গেলে আর একটু সলিড প্রমাণ দরকার।

শতদল তার বিখ্যাত ডায়রিটায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে আমাকে জিজ্ঞেস করল এখানে কে কে মিথ্যে বলেছে?

– শায়ক ও বলাকা।

– আর?

– আর তো কেউ বলেনি ওরা ছাড়া?

– বাঃ মলয় দত্তর কথা ভুলে গেলে?

– তিনি আবার কি বলেছিলেন?

– ভুলে গেলে? ভালুকপংয়ে নদীর ধারে না গিয়েও সেখানে যাবার গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলেন সবার কাছে।

আমি আর প্রবীর চুপ করে রইলাম। তদন্তের এই পর্যায়ে শতদল নানারকম প্রশ্ন করে নিজের জিজ্ঞাসারই উত্তর খোঁজে। ডায়রিতে মলয় দত্তর পাশে চারটে নাম লেখা। শতদল নিজের মনেই বিড়বিড় করে পেশার দিক দিয়ে লেদার গুডস ব্যবসায়ী দিল্লির বাসিন্দা। তার সঙ্গে কলকাতার ডাক্তার– এমনিতেই চান্স নেই যদি না সেই ভুল চিকিৎসার কেসের সঙ্গে– নাঃ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ডাক্তার খুন হবার কথা। অরিন্দম অবসর নিয়েছেন চারবছর। তার আগে বিদেশী ব্যাংক। লোন-টোন এটসেটেরা সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সেটাও ওপর ওপর হবার সম্ভাবনাই বেশি। শায়কের অয়েল রিফাইনারি মেনট্যানান্সের সঙ্গে লেদার গুডস যাচ্ছে না। অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটায় অবশ্য একটা প্যাঁচ আছে। শতদল একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখেছে শায়কের নামের পাশে। বেণুগোপালের বিজ্ঞাপনের এজেন্সি। কারওকেই তো ধরা যাচ্ছে না। শতদল হতাশ হয়ে ডায়েরি বন্ধ করে। আমি একটু ইতস্তত করেই বললাম– বেণুগোপাল যদি ওই কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কাজ করে তবে টেনেটুনে একটা সম্পর্ক বার করা যায়।

শতদল খানিক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল– ভাল বলেছ তো আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েই দেখা যাক। প্রবীর তোমার দপ্তরকে বলতে পার 'ব্লু বয়' এ্যাড এজেন্সির ব্যাংক এ্যাকাউন্টসের লাস্ট তিন বছরের একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে নর্দান লেদার্সের সঙ্গে কোন লেনদেন হয়েছে কিনা একটু দেখে নিয়ে যেন আমাদের জানিয়ে দেয়। ওর পার্টনারের প্রোফাইল আর স্টেটমেন্টটাও একবার যেন দেখে নেয়।

পাহাড়ের মাথায় এখনও রোদ ঝলমল করছে কিন্তু হাওয়াটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। প্রবীর বলল– এবার উঠবেন? শতদল যেন শুনতেই পায়নি এভাবে বসেই রইল। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল– আচ্ছা মলয় দত্তর শেষ কথাটা তোমাদের মনে আছে?

আমি বললাম হ্যাঁ জল চেয়েছিল।

– ধ্যাৎ যে কথাটা শেষ বলেছিল। প্রবীর ও আমি দুজনেই মনে করতে না পেরে ঘাড় নাড়ি।

– মাঙ্গাজি। একথাটার মানে কি? এটাই ওঁর শেষ কথা। কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি ওপর দিকে হাত দেখিয়ে? আমাকে ভাবাচ্ছে কথাঁাঠ।

– ছেলেটা তো বলল জল চাইছিল।

– তাহলে তো 'পানি' বলতেন।

মাঙাজি, মাগাজি, মানাজি, মাকাজি শতদল কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বলতে হাঁটে।

দিরাং ১৬ই অক্টোবর

আর দুটো রাত। পরশু সকালেই গৌহাটি থেকে যে যার গন্তব্যে চলে যাবে। আমি এবার চোরা উদ্বেগ অনুভব করি।

শতদল অত্যন্ত স্বাভাবিক সহাস্য এবং প্রশান্ত। এখনও পর্যন্ত আমাদের আসল পরিচয়টাও দেওয়া হয়নি। প্রবীর শতদলকে সে কথা বলতেই সে বলল– দরকার কি। যা জানার এমনিতেই যখন জেনে যাচ্ছি।

– বাঃ মলয় দত্ত খুন হবার ঠিক আগে কে কি করছিল আলাদা করে জিজ্ঞেস না করলে জানবে কি করে?

– জেনেছি তো। মেয়েরা বোর হয়ে গল্প করছিল গাড়িতেই বসে। বেণুগোপাল জলত্যাগ, মলয় দত্তর ছবি, অরিন্দম উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি, বিশ্বাস মেয়েদের গাড়ির পেছনের সিটে, দাশগুপ্ত ও দীপক তর্কাতর্কি, প্রথমা মায়ের কাছে, প্রত্যয় ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ির হর্ন মেরামতি– হল?

– এই রেকারিং ডেসিমেল থেকে কি বোঝা গেল? আমি রাগ চেপে জিজ্ঞেস করি।

– বোঝা গেল– একজন মিথ্যে বলেছে।

– কে?

– সেটা বলে লাভ নেই। আগে জানতে হবে কেন বলেছে?

এইবার আমি সত্যি সত্যি রেগে যাই– তোমার এই শব্দ নিয়ে জাগলারি বন্ধ কর। বলতে হলে বলবে না হলে বলবে না।

প্রবীরও যোগ দিল আমার সঙ্গে– সত্যি শতদলদা এটা কিন্তু আন ফেয়ার। বিষ্ণুর সঙ্গে সমানে কথা বলছেন আড়ালে। আমাদের এতটা অন্ধকারে রাখা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি একটা কিছু আঁচ করছেন কিন্তু আমাদের সেটা বলছেন না।

শতদল তার স্বাভাবিক ঠাট্টার ভঙ্গী মুছে ফেলে গম্ভীরভাবে বলল– আমি এখন আবার বিষ্ণুর ফোনের জন্য অপেক্ষা করছি।

বিষ্ণুর ফোনটা এল আচমকা। আমরা তখন সবাই খাবার ঘরে। খোলামেলা আড্ডার পরিবেশ। এমনকি আজ শায়ক বলাকাও অনেক স্বচ্ছন্দ। আবার প্রেমহীন দাম্পত্যে ফিরে যাবার আগের কয়েক মুহূর্ত প্রাণপণে উপভোগ করে নিতে চাইছে চুরি করা উত্তেজনা। আর হয়তো কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না তাই সবাই মন খুলে হাসিঠাট্টা করছে। ঠিক এই সময়ই বিষ্ণুর ফোনটা এল আর শতদল বেরিয়ে গেল খাবার ঘর থেকে। বেণুগোপাল বলল– আপনাদের সারাক্ষণ খুব জরুরি আর গোপন ফোন আসে দেখছি। আমরা একটু অপ্রস্তুতভাবে বসে রইলাম

আমার আর প্রবীরের মনে অজস্র প্রশ্নের জন্ম দিয়ে শতদল চুপ করে গেল আচমকা। কোথায় খটকা ছিল, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ আবিষ্কার হল সে সবের ধার পাশ দিয়ে না গিয়ে সে বলল– ডাঙায় তোলা মাছের মত টেনশনে ছটফট না করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আলোচনা ও কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করলে উপকার হয়। প্রত্যয়ের ম্যাজিক শো দেখবে তো চল।

কয়েক মুহূর্ত। এদিকে আমাদের মনটাও শতদলের সঙ্গে উধাও। প্রবীরও উসখুস শুরু করে দিল। আমরা আর কিছুক্ষণ কোনরকমে দলের সঙ্গে কাটিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছাড়লাম।

শতদল ফোন নিয়ে চলে গিয়েছে বহুদূর। অন্ধকার বারান্দা ধরে সেইদিকে এগোতে গিয়ে আমরা আচমকা কান্নার ফোঁপানির সঙ্গে অস্ফুট কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলাম। অপর্ণার ঘরের দরজা দিয়ে অরিন্দম বাগচী বেরিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে যেন ভুত দেখার মত চমকে উঠলেন। খাবার ঘরে যে ওঁকে দেখিনি সেটা খেয়াল করলাম এতক্ষণে। অরিন্দমের পেছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার সময় অপর্ণার শাড়ির এক ঝলক দেখতে পেলাম। অরিন্দম আবছাভাবে কি যেন একটা বলে হন হন করে এগিয়ে গেলেন খাবার ঘরের দিকে। প্রবীর হতভম্ব হয়ে বলল– কেসটা কি হল বলুন তো? সামনাসামনি তো কখনও দুজনকে কথা বলতে দেখিনি।

আমার মনে হল এই রহস্যের সমাধান ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ট্যুরিস্ট লজের গা ঘেঁসে ছুটে চলেছে জিয়াভরলি নদী। নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য লজের শেষপ্রান্তে লগ হাউস। শতদলকে দেখলাম লগহাউসের দোতলায় বসে আছে। ওর শান্ত হয়ে বসে থাকা দেখেই বুঝতে পারলাম কোন পথে এগোতে হবে তার একটা আন্দাজও অন্তত করতে পেরেছে।

প্রবীর আসার সময় যা দেখেছে সেটা বলল। শতদল বলল– তার মানে বুঝছ বিষ্ণুর দেওয়া খবরের বাইরেও আরও কত কি থেকে যাচ্ছে। সুতো টানতে টানতে মনে হয় এদের সবার জন্ম সময়ে পৌঁছে যাব।

– যা বলেছেন। এখন বোধহয় কানেকশন ভাল। একবার দপ্তরে ফোন করে দেখি তো ব্যাংক স্টেটমেন্টের বিষয়ে কিছু জানা গেল কিনা। প্রবীরের কানে ফোন। হাতে উদ্যত কলম। সামনে ডায়রির সাদা পাতা। প্রবীরের অবশ্য কিছু লিখবার প্রয়োজন হল না। ফোন বন্ধ করে বলল– নাঃ ব্যাড লাক। কারও স্টেটমেন্টেই নর্দান লেদার্সের সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া যায়নি। বিষ্ণু আপনার কথা মত স্টেটমেন্টের সঙ্গে বেণুগোপালের পার্টনারের একটা ছোট প্রোফাইলও দিয়ে দিয়েছে– রণজয় মুখার্জি। অবস্থা স্বচ্ছল। নিজের বাড়ি। পিতৃমাতৃহীন। বাবা ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। কাকা-কাকিমার কাছে মানুষ। পাড়ার কারও সঙ্গে মেলামেশা নেই। অবিবাহিত। বান্ধবী আছে। মলয় দত্তের এ্যাকাউন্টসেও এ্যাবনর্মাল কিছু পাওয়া যায়নি।

শতদল হতাশ হয়ে বলল– এ্যাবনর্মাল কি নর্মাল সবটা বোঝার জন্যই তো আমাদের অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আর তার ওপর ভর করেই এগোতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

কথা বলতে বলতেই শতদল ফোনের বোতাম টেপে। তাকে সামান্য উত্তেজিত মনে হয়। আমরা শুনলাম সে বিষ্ণুকে বলছে– পার্টনারটির ডিটেল খোঁজ নাও। পাড়া বাড়ি যেখান থেকে যা পাও।

ফোন বন্ধ করে প্রবীরকে সে বলল– এতদূর থেকে লোকের মুখে শুনে শুনে তদন্ত করা যে কি কঠিন। আচ্ছা, মলয় দত্তর দিল্লির বাড়ি ও অফিস একবার ভাল করে সার্চ করার কথা ছিল না? সেটা হয়েছে কি?

প্রবীর বলল, বলা তো হয়েছিল কিন্তু ওটা ফলো-আপ করতে একদম ভুলে গিয়েছি। আসলে অতটা ইম্পর্ট্যান্ট মনেও হয়নি। খুনী কি আর দিল্লি পর্যন্ত ধাওয়া করে তার পরিচয় রেখে আসবে? তবু একবার দেখি দিল্লিতে ফোন করে।

প্রবীর আবার নম্বর মেলায়। কানে ফোন চেপে রিঙের আওয়াজ শুনে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঙ্গী করে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলে শতদলকে জিজ্ঞেস করে– আপনি কথা বলবেন?

শতদল কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দেয়। একাগ্র হয়ে শোনে অপর দিকের কথা। কথা শেষ হলে পর আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করি– কি? কিছু পাওয়া গেল?

– যেটা পাবার আশা করছিলাম এদের কারও সঙ্গে যোগসূত্র– সেটা পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার বদলে অন্য একটা অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

– কী? কী? প্রবীর ও আমার দুজনেরই উদগ্রীব জিজ্ঞাসা।

অরুণাচলের ম্যাপ, ভ্রমণসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র। তার মানে মলয় দত্ত অরুণাচল আসা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। এছাড়া ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের যাবতীয় পেপার কাটিং একটা ফাইলে খুব যত্ন করে ডেট মিলিয়ে গুছিয়ে রাখা। আর দেখা যাচ্ছে সত্যিই বেশ সফল ও সুখী লোক ছিলেন এই মলয় দত্ত। নিজের ৬০ বছরের জন্মদিনে ইংরেজি-বাংলা কাগজে ছবিসহ নর্দান লেদার্সের কর্মীবৃন্দের শুভেচ্ছা, দত্তদম্পতির যুগল ছবির সঙ্গে মা-বাবার দীর্ঘ জীবন কামনা করে মেয়ে মধুপর্ণা জামাই সৌগত আর নাতনি মালবিকার শুভেচ্ছা সব আর একটা ফাইলে রাখা আছে মলয় দত্তর নিজস্ব ড্রয়ারের মধ্যে।

– এটাকে কি ক্লু বলা যায়? শতদল পেন দিয়ে নোটবুকে হিজিবিজি লিখতে আপনমনে বলে– হয়তো– হয়তো নয়– তবে তাওয়াংয়ের সঙ্গে একটা যোগসূত্র তো অতি অবশ্যই আছে। সব থেকে মজার ব্যাপারটা হল আমার যেখানে খটকা ছিল ঠিক সেখানে আলোটা এসে পড়েছে।

আমার আর প্রবীরের মনে অজস্র প্রশ্নের জন্ম দিয়ে শতদল চুপ করে গেল আচমকা। কোথায় খটকা ছিল, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ আবিষ্কার হল সে সবের ধার পাশ দিয়ে না গিয়ে সে বলল– ডাঙায় তোলা মাছের মত টেনশনে ছটফট না করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আলোচনা ও কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করলে উপকার হয়। প্রত্যয়ের ম্যাজিক শো দেখবে তো চল।

• আগামী সংখ্যায়

ঋতা বসু
ভারতের কথাসাহিত্যিক

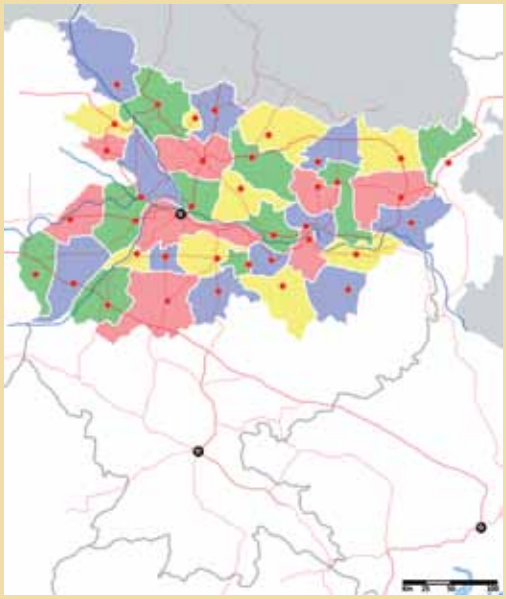

এক নজরে সিকিম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	পাটনা
জেলা	৩৮টি
প্রতিষ্ঠা	১ এপ্রিল ১৯৩৬
সরকার	
• শাসকবর্গ	বিহার সরকার
• রাজ্যপাল	কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
• মুখ্যমন্ত্রী	নীতিশ কুমার
• আইনসভা	দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বিধান পরিষদ ৭৫ বিধান সভা ২৪৩
• হাই কোর্ট	পাটনা হাই কোর্ট
আয়তন	
• মোট	৯৪,১৬৩ বর্গকিমি (৩৬,৩৫৭ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	ত্রয়োদশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	১০,৩৮,০৪,৬৩৭
• ক্রম	তৃতীয়
• ঘনত্ব	১১০২/বর্গকিমি (২৮৫০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-BR
সরকারি ভাষা	হিন্দি, উর্দু
ওয়েবসাইট	gov.bih.nic.in

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

নীতিশ কুমার

রাজ্য পরিচিতি

বিহার

বিহারকে একইসঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ভারতের ত্রয়োদশ বৃহত্তম রাজ্য, এর ক্ষেত্রফল ৯৪ হাজার ১৬৩ বর্গকিলোমিটার (৩৬ হাজার ৩৫৭ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য। এর পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ, উত্তরে নেপাল, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণে ঝাড়খন্ড। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত গঙ্গানদী বিহারের সমতল ভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বিহার হচ্ছে ৩টি প্রধান সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের সংমিশ্রণ, এগুলি হচ্ছে মগধ, মিথিলা ও ভোজপুর। ২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর বিহারের দক্ষিণাঞ্চল ভেঙে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বিহারের মাত্র ১১.৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে। হিমাচল প্রদেশের পর এ সংখ্যা সর্বনিম্ন।

বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তি

বিক্রমশিলা বৌদ্ধবিহার

অধিকন্তু প্রায় ৫৮ শতাংশ বিহারীর বয়স ২৫ বছরের নীচে, যা বিহারকে ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ তরুণ জনসংখ্যার রাজ্যে পরিণত করেছে। রাজ্যের সরকারি ভাষা হিন্দি ও উর্দু। রাজ্যে অন্যান্য ব্যবহৃত ভাষাগুলি হচ্ছে ভোজপুরি, মৈথিলি, মাগাহি, বাজ্জিকা ও অঙ্গিকা। এর মধ্যে মৈথিলিকে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে।

প্রাচীন ও চিরায়ত ভারতের যে-অঞ্চলটি এখন বিহার নামে পরিচিত, একদা এটি ক্ষমতা, জ্ঞানার্জন ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। মগধ থেকে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য এবং বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক জন-সংশ্লিষ্ট ধর্ম বৌদ্ধবাদের উৎপত্তি হয়েছে। মগধের দুই সাম্রাজ্য মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহত্তর অঞ্চলকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনে একত্রিত করেছিল। বিহারের আরেকটি অঞ্চল হচ্ছে মিথিলা যা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষার একটি আদি কেন্দ্র এবং বৈদেহী রাজত্বের কেন্দ্র।

১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত বিহার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক পিছিয়ে ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বিহারি উপ-জাতীয়তাবাদের অভাবে বিহারের প্রতি ঔদাসীন্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন মাসুল সমতা নীতির কারণে বিহারের উন্নতি হয়নি বলে অনেক অর্থনীতিক ও সমাজবিজ্ঞানী দাবি করেন। তবু উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে বিহার বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে। উন্নত শাসনের ফলে অবকাঠামো খাতে বর্ধিত বিনিয়োগ, উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব এবং অপরাধ ও দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে রাজ্যে অর্থনৈতিক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।

নামকরণ

বিহার নামটি এসেছে সংস্কৃত ও পালি শব্দ 'বিহার' থেকে যার অর্থ হচ্ছে আশ্রয়। বর্তমান রাজ্যকাঠামো বৌদ্ধ বিহার-অধ্যুষিত– প্রাচীন ও মধ্যযুগে এখান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনেক বিহার ছিল। মধ্যযুগের লেখক মিনহাজ আল সিরাজ জুযানি ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বই *তাবাকাত-ই-নাসিরি*তে লেখেন যে, বুদ্ধগয়া থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে এখন যে-জায়গাটি বিহার শরীফ নামে পরিচিতি, সেখানে বখতিয়ার খিলজি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।

ইতিহাস

প্রাচীনকাল: সরন জেলায় গঙ্গা নদীর উত্তরপাড়ে চিরাড় নামক স্থানে প্রায় ২৫০০-১৩৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় পুস্তকাদি ও মহাকাব্যে মগধ, মিথিলা ও অঙ্গর মত বিহারের অঞ্চলসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর্যদের বসতি স্থাপনের পর মিথিলা প্রথম গুরুত্ব লাভ করে বৈদেহ রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভের ফলে। বৈদিক যুগের শেষভাগে (১১০০-৫০০ খ্রি.পূ.) কুরু-পাঞ্চালের সঙ্গে বিদেহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিদেহ রাজ্যের রাজাদের জনক বলা হত। বাল্মীকি রচিত হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে আছে যে, মিথিলার এক জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে ভগবান রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিদেহ রাজ্য পরে বাজ্জির সঙ্গে একীভূত হয়, তখন এর রাজধানী হয় বৈশালী। বৈশালীও মিথিলার অন্তর্গত। বাজ্জি ছিল একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থিত রাজ্য, যেখানে মহারাজা নির্বাচিত হতেন রাজাদের মধ্য থেকে। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, বাজ্জি প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে (বুদ্ধের জন্ম ৫৬৩ খ্রি. পূর্বাব্দ)। এটিই পৃথিবীর প্রথম প্রজাতন্ত্র।

আজকের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বিহার অঞ্চলকে বলা হত মগধ– এটি হাজার বছর ধরে ভারতের ক্ষমতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ৬৮৪ খ্রি.পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত হর্যঙ্ক (Hariyanka) রাজবংশ রাজগৃহ নগর (বর্তমান রাজগির) থেকে মগধ শাসন করতেন। এই রাজবংশের দুই সুপরিচিত রাজা হলেন বিম্বিশার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রু। অজাতশত্রু সিংহাসনের জন্য তাঁর পিতাকে কারাবদ্ধ করেছিলেন। অজাতশত্রু পাটলীপুত্রে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে মগধের রাজধানী হয়। তিনি বাজ্জির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও বিজয়লাভ করেন। হর্যঙ্ক রাজবংশের পরে শিশুনাগ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নন্দ রাজবংশ বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড শাসন করেন।

নন্দ রাজবংশের পর ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। মৌর্য সাম্রাজ্য ও বৌদ্ধধর্ম যে অঞ্চলে উদ্ভূত হয়, সে-অঞ্চলটিই আজকের বিহার। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধ থেকে ৩২৫ খ্রি.পূর্বাব্দে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্তের জন্ম মগধে। এর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা)। মৌর্য সম্রাট অশোক ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। অশোকের জন্ম পাটলীপুত্রে।

২৪০ খ্রিস্টাব্দে মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য। এটি ভারতের বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, বাণিজ্য, ধর্ম ও দর্শনের স্বর্ণযুগ বলে প্রসিদ্ধ। একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজবংশের রাজেন্দ্র চোল-১ বিহার ও বাংলা দখল করেন।

মধ্যযুগ

মগধে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয় মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির দখলের পর। এসময় বহু বিহার এবং বিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণহানি হয় বলে দাবি করা হয়। তবে ডি এন ঝা মনে করেন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ের ফলশ্রুতি ছিল এসব ঘটনা। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঠান সেনাপতি সাসারামের শের শাহ সুরী মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের বাহিনিকে পরাজিত করে আধুনিক ভারত দখল করেন। শের শাহ দিল্লিকে তাঁর রাজধানী ঘোষণা করেন।

একাদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলা বিভিন্ন দেশীয় রাজবংশের শাসকদের শাসনাধীন ছিল। এসব রাজবংশের প্রথমে ছিল কর্নাট বংশ। তারপর আসে উইনবর রাজবংশ, রঘুবংশী ও শেষে রাজ দারভাঙ্গা। দারভাঙ্গা রাজের শাসনামলে মিথিলা থেকে রাজধানী দারভাঙ্গায় স্থানান্তরিত

সাসারাম শহরে শের শাহ সুরীর সমাধিসৌধ

পাটলীপুত্র করুণা স্তূপ

হয়।

শিখধর্মের দশম ও শেষগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম পাটনায়।

ঔপনিবেশিক যুগ

১৭৬৪ সালে বিহারের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি (অর্থাৎ প্রশাসনিক ও কর আদায়) অধিকার লাভ করে। উর্বর জমির সমৃদ্ধ সম্পদ, জল ও দক্ষ জনশক্তি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিহারের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে পর্তুগিজ ও ব্রিটিশরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিহারে এসে জড়ো হয়। বিদেশী উদ্যোক্তরা বিহারে একাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলে। ১৯১২ সাল পর্যন্ত বিহার ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ ছিল। তারপর ওড়িশা ও বিহার আলাদা হয়ে দুটি প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১০ সাল থেকে বিহার ২২ মার্চকে তার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে

চম্পারণের চাষীরা নীলচাষের বিরুদ্ধে ১৯১৪ সালে (পিপরায়) ও ১৯১৬ সালে (তুরকাউলিয়ায়) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধী চম্পারন সফরে এলে রাজকুমার শুক্ল ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বঞ্চনার কাহিনি তুলে ধরেন। এর ফলে গান্ধীজি চম্পারণ সত্যাগ্রহের ঘোষণা দেন। এতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অনুগ্রহনারায়ণ সিনহার মত বহু বিহারি জাতীয়তাবাদী অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর ও মধ্য বিহারে কিষাণসভা স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে এর সূচনা হয়। স্বামী সহজানন্দ বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা গঠন করে জমির দখলদারিত্বের ওপর জমিদারী আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। বিহার থেকে এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিকে ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে নিখিল ভারত কিষাণ সভা গঠিত হয় এবং সহজানন্দ সরস্বতী এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতায় পর বিহারি অভিবাসী শ্রমিকরা মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, আসামসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সহিংসতা ও কুসংস্কারের শিকার হয়।

ভূগোল ও জলবায়ু

বিহারের জলবায়ু বৈচিত্র্যময়। তাপমাত্রা এত আধা-উষ্ণমণ্ডলীয়– গ্রীষ্মে গরম, শীতকালে ঠাণ্ডা। বিহারের উর্বর সমভূমি গঙ্গা ও এর উত্তরের শাখা নদী গন্ধক ও কেশি বিধৌত। এর উৎপত্তি নেপালের হিমালয়ে। অপরদিকে বাগমতির উৎপত্তি কাঠমাণ্ডু উপত্যকায়। এসব নদী নিয়মিত বিহার সমভূমিকে প্লাবিত করে। বিহার ২৪°-২০'-১০" উত্তর থেকে ২৭°-৩১'-১৫" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৩°-১৯'-৫০" পূর্ব থেকে ৮৮°-১৭'-৪০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে এর গড় উচ্চতা ১৭৩ ফুট (৫৩ মিটার)। গঙ্গা বিহারকে দুই অসম খণ্ডে বিভক্ত করে মাঝ বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার শাখা নদীগুলি হচ্ছে সোন, বুধি গন্ধক, চন্দন, ওরহানি ও ফল্গু। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর হিমালয়ের সঙ্গে নেপালের দূরত্ব অতি অল্প, এ কারণে এই পর্বতমালা বিহারের ভূমিরূপ জলবায়ু, জলপ্রবাহ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। বিহারের মধ্যাঞ্চলে রাজগির পাহাড়ের মত কিছু ছোট ছোট পাহাড় আছে। দক্ষিণের দিকে ছোট নাগপুর মালভূমি– যা ২০০০ সাল পর্যন্ত বিহারের অংশ ছিল। এখন এটি ঝাড়খণ্ড নামে আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণি

বিহারের চিহ্নিত বনাঞ্চল ৬ হাজার ৭৬৪ বর্গকিমি (২ হাজার ৬১২ বর্গ মাইল), যা রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার ৭.২ শতাংশ। সোমেশ্বরের উপ-হিমালয়ান পাদদেশ এবং চম্পারণ জেলার দুন বনাঞ্চল হচ্ছে বাষ্পীয় পর্ণমোচী বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে গুল্ম, ঘাস ও আগাছাও রয়েছে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১ হাজার ৬০০ মিলিমিটার (৬৩ ইঞ্চি) যার ফলে বিলাসবহুল শালবন প্রসার লাভ করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাছ হচ্ছে শাল, সেগুন, খয়ের ও শিমুল। সহর্ষ ও পূর্ণিয়া জেলায় পর্ণমোচী বৃক্ষের দেখা পাওয়া যায়। শোরিয়া রোবাস্টা (শাল), ডাইয়োস্পাইরোস মেলানেক্সিলন(কেন্দু), বোসওয়েলিয়া সেরাটা (সালাই), টার্মিনালিয়া টোমেনটোস (অসন), টার্মিনালিয়া বেল্লেরিকা (বহেরা), টার্মিনালিয়া অর্জুনা (অর্জুন), টেরোকার্পাস মার্সুপিয়াম (পাইসর), মাধুকা ইন্ডিকা (মহুয়া) হচ্ছে বিহাবের সুলভ বৃক্ষরাজি। ৮০০ বর্গ কিমি (৩০৯ বর্গ মাইল) এলাকাজুড়ে পশ্চিম চম্পারণ জেলায় বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান ভারতের অষ্টাদশ ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য। বাঘের সংখ্যানুপাতে এটির অবস্থান চতুর্থ। এর বিশাল ভূ-প্রকৃতি সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণি ও উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল।

জনমিতি

বিহারে হিন্দু ৮২.৬৯ শতাংশ, মুসলমান ১৬.৮৭ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১২ শতাংশ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ ০.৩১ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, বিহার ভারতের তৃতীয় অধিক জনবহুল রাজ্য। মোট জনসংখ্যা

আইআইটি পাটনা প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশপথ

প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ

এনআইটি পাটনা প্রধান ভবন

১০ কোটি ৪০ লাখ ৯৯ হাজার ৪৫২ জন। বিহারের জনসংখ্যার প্রায় ৮৯ শতাংশ গ্রামে বাস করে। জনসংখ্যার প্রায় ৫৮ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের নীচে, এটি ভারতের সর্বোচ্চ। ঘনত্ব ৮৮১। লিঙ্গ অনুপাত ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯১৯। বিহারের জনসংখ্যার অধিকাংশ ইন্দো-আর্যভাষী জাতিগত গোষ্ঠী, এ ছাড়া কিছু দ্রাবিড়ভাষী ও অস্ট্রো-এশিয়াটিকভাষী মানুষ রয়েছে প্রধানত ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে (অবশ্য এটি এখন ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত)। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর এখানে পাঞ্জাবি হিন্দু শরণার্থীরা আশ্রয় নেয়। বিহারে সাক্ষরতার হার ৬৩.৮২ শতাংশ (যার মধ্যে ৭৫.৭ শতাংশ পুরুষ, ৫৫.১ শতাংশ নারী)। গত এক দশকে সাক্ষর নারীর সংখ্যা ২০ শতাংশ বেড়েছে।

বিহারে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১১.৩ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বিহার এখন ভারতের সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ রাজ্য।

বিহারে মোট ৩৮টি জেলা। এর মধ্যে প্রধান প্রধান শহরগুলি হচ্ছে: পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুজাফফরপুর, পুর্ণিয়া, দারভাঙ্গা, বিহার শরীফ, (নালন্দা), আরাহ (ভোজপুর), বেগুসরাই, কাটিহার, মুঙ্গের, ছাপড়া (সরন), সহর্ষ ও হাজিপুর (বৈশালী)।

সরকার ও প্রশাসন

বিহার সরকারের সাংবিধানিক প্রধান হচ্ছেন গভর্নর, তাঁকে নিয়োগ দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তবে প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোট সরকার গঠন করে।

রাজ্যের আমলাতন্ত্রের প্রধান হলেন মুখ্যসচিব। এই পদের অধীনে আইএএস, আইপিএস ও রাজ্য প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি বিচারবিভাগের প্রধান। ১৯১৬ সাল থেকে বিহার হাই কোর্ট বিদ্যমান। সরকারের সকল বিভাগের অবস্থান রাজধানী পাটনায়।

রাজ্যে ৯টি বিভাগে ৩৮টি জেলা, ১২টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৪৯টি নগর পরিষদ ও ৮০টি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে।

দারভাঙ্গা মনুমেন্ট

অর্থনীতি

২০১৩-১৪ সালে বিহারের গড় দেশজ উৎপাদন ছিল প্রায় ৩৬,৮৩৩৭ কোটি আইএনআর। এর ২২ শতাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। সেবাখাত ও শিল্প থেকে আসে যথাক্রমে ৭৩ ও ৫ শতাংশ।

গড় রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে বিহার দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী রাজ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৭.০৬ শতাংশ। একই অর্থবছরে বিহারে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৪০.৬ শতাংশ।

কৃষি

বিহার ভারতের বৃহত্তম সবজি এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল উৎপাদনকারী রাজ্য। রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। বিহারের প্রধান কৃষিজাত পণ্য হচ্ছে লিচু, পেয়ারা, আম, আনারস, বেগুন, ঢেড়স, ফুলকপি, গাজর, ধান, গম ও আখ। তবে অনাবৃষ্টি প্রায় প্রতিবছর ধান উৎপাদন ব্যাহত করে।

শিল্প

আন্তর্জাতিক মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিহার তাদের উৎপাদন ইউনিট তৈরি করেছে। তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠান– ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিস গ্রুপ, ড্যানিস ব্রিউয়ারি কোম্পানি চার্লসবার্গ গ্রুপ এবং কোবরা রিয়ার। এদের মধ্যে কোবরা রিয়ার ২০১২ সালে পাটনা ও মুজফফরপুরে নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে।

পাটনার সন্নিকটবর্তী হাজিপুর বিহারের একটি প্রধান শিল্পনগরী হিসেবে খ্যাত। এটি গঙ্গা সেতু ও চমৎকার সড়ক অবকাঠামোর মাধ্যমে রাজধানী পাটনার সঙ্গে সংযুক্ত।

২০০৭ সালে জিডিপির ৭৭ শতাংশে রাজ্যের ঋণ ছিল। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মত বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ সুবিধাদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প, আইটি অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে পাটনায় রেজিস্ট্রিভুক্ত সিকিউরিটি এন্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস (এসআইএস) ইন্ডিয়া লিমিটেড আমেরিকান ব্যবসায় গ্রুপ ইউনাইটেড টেকনোলজিস কর্পোরেশন (ইউটিসি)-এর অস্ট্রেলিয়ান গার্ড এন্ড মোবাইল সার্ভিস ব্যবসায় কিনে নিয়েছে। মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে পাটনা ভারতের অন্যতম অগ্রসর শহর। রাজ্য সরকার নালন্দা জেলার রাজগিরে একটি আইটি নগর গড়ে তুলেছে। ভারতের প্রথম মিডিয়া হাবও বিহারে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আছে। রাজ্যের ৩৮টি জেলার মধ্যে পাটনা, মুঙ্গের মজফফরপুর ও বেগুসরাইয়ের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি।

সংস্কৃতি

ভাষা ও সাহিত্য: হিন্দি ও উর্দু রাজ্যের দুই সরকারি ভাষা। অন্যান্য ভাষা যেমন ভোজপুরী (৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে), মৈথিলি

পাখির চোখে পাটনা শহর

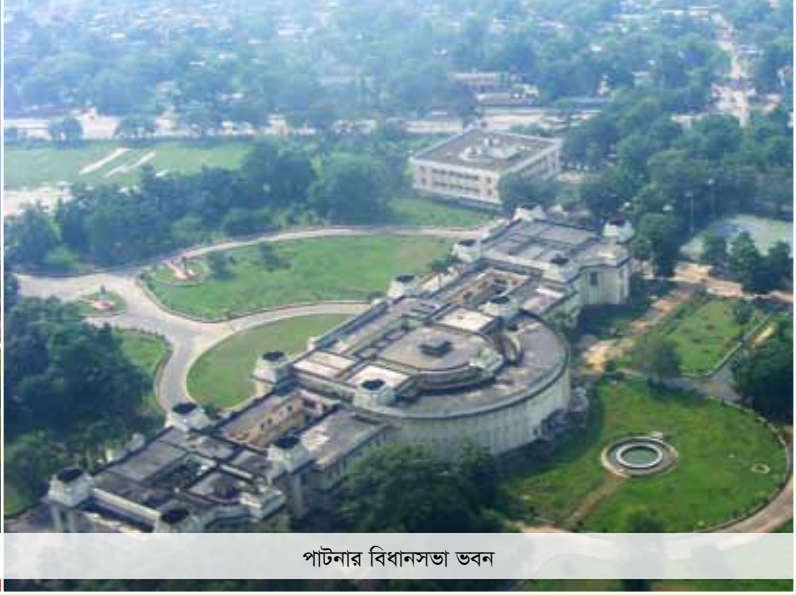

পাটনার বিধানসভা ভবন

(২ কোটি ৫০ লাখ), মাগহি (২ কোটি), বাজ্জিকা (৮৭ লাখ) ও অঙ্গিক (৭ লাখ)। এসবের মধ্যে মৈথিলিকে ভারত সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। হিন্দিভাষী বলয়ে ভোজপুরী ও মাগহি সামাজিক ভাষা, তবু এটি রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পায়নি।

সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উর্দুর অবস্থান দ্বিতীয়। কিষাণগঞ্জের মত উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে সুরজপুরি ভাষা প্রচলিত আছে।

চিত্রকলা

বিহারে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার ধারা অনুশীলিত হয়। একটি হচ্ছে মিথিলা চিত্রকলা– বিহারের মিথিলা অঞ্চলে ব্যবহৃত ভারতীয় চিত্রধারা। মিথিলা অঞ্চলের মেয়েরা সাধারণত বংশ পরম্পরায় এ চিত্রধারায় পারদর্শিতা অর্জন করেছে। সাধারণত উৎসব, ধর্মীয় পালা-পার্বণ এবং জীবনচক্রের অন্যান্য বড় ঘটনা যেমন জন্মদিন, উপনয়ন, বিবাহের সময় বাড়িঘরের দেয়ালে এ চিত্রকলা আঁকা হয়।

কিংবদন্তী আছে, এ চিত্রধারা রামায়ণের যুগ থেকে চলে আসছে। ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কন্যা সীতার বিবাহ উপলক্ষে রাজা জনক শিল্পীদের রাজপুরী সজ্জিতকরণের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মিথিলা চিত্রকলা সাধারণত নতুন মাটির দেয়ালে করা হয়। তবে এখন কাপড়, হাতে তৈরি কাগজ ও ক্যানভাসেও আঁকা হচ্ছে। বিখ্যাত মিথিলা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী ভারতী দয়াল, মহাসুন্দরী দেবী, প্রয়াতা গঙ্গা দেবী ও সীতা দেবী।

মিথিলা চিত্রকলাকে মধুবনী শিল্পও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এসব চিত্রকলার বিষয়। যে-সব চিত্র সাধারণত আঁকা হয়ে থাকে, তার মধ্যে আছে প্রাচীন মহকাব্যের কৃষ্ণ, রাম, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে সূর্য, চাঁদ ও ধর্মীয় গাছ-গাছড়া। আরও আছে রাজদরবার ও বিবাহের মত সামাজিক অনুষ্ঠান। সাধারণত দেয়াল বা ক্যানভাসের পুরোটা জুড়ে এ চিত্র আঁকা হয়, কোনও অংশ খালি থাকে না।

মঞ্জুষা কলা বা অঙ্গিকা শিল্প হচ্ছে বিহারের আরেক শিল্পরূপ, অঙ্গ এলাকায় অনুশীলিত হয়ে থাকে। কোম্পানি পেইন্টিং নামে কথিত পাটনা শিল্পধারা (পাটনা সলাম) বিহারে বিকাশ লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। পাটনা শিল্পধারা মুঘল মিনিয়েচার শিল্পধারারই অপভ্রংশ। মুঘল চিত্রকলার হিন্দু কারিগরদের অধঃস্তন পুরুষেরা এ শিল্পকলার চর্চা করত। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাধার মুখে এসব কারিগর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ হয়ে পাটনায় এসে আশ্রয় নেয়। তাদের শিল্পে মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য থাকত, কিন্তু মুঘল চিত্রকলায় শুধু য়ে রাজকীয় ও রাজদরবারের ছবি থাকত, এখন তার জায়গায় বাজারের দৃশ্য সন্নিবেশিত হতে থাকল। তারা কাগজ বা মাইকার ওপর জলরং ব্যবহার করত। তাদের চিত্রধারায় বিষয়বস্তু হতে শুরু করল দৈনন্দিন জীবন, স্থানীয় নিয়মকানুন, উৎসবাদি ও নানা অনুষ্ঠান। শ্রী রাধামোহনের নেতৃত্বে এই শিল্পধারা ক্রমে পাটনা শিল্পধারা নামে বিকাশ লাভ করল। ক্রমে বিহারের চারুকলায় এই শিল্পধারা একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল।

পারফর্মিং বা ফলিত শিল্প

বিহার ভারতরত্ন ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ ও ধ্রুপদ গায়ক মল্লিকদের (দারভাঙ্গা ঘরানা) ও মিশ্রদের (বেত্তিয়া ঘরানা) মত সংগীতগুণীর জন্ম দিয়েছে। এর সঙ্গে ছিলেন কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর, মৈথিলি সংগীতে যাঁর অবদান অপরিসীম। বিহারের শাস্ত্রীয় সংগীত হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতেরই আরেক রূপ। গয়া শাস্ত্রীয় সংগীতের আরেকটি অনুপম কেন্দ্র– বিশেষ করে টপ্পা ও ঠুমরির রকমারির জন্য বিখ্যাত। রামপ্রসাদ মিশ্রর পুত্র পণ্ডিত গোবর্ধন মিশ্র নিজেই একজন সিদ্ধ গায়ক– আজকের ভারতের জীবিত টপ্পা গায়কদের মধ্যে সর্বোত্তম। বানাইলির চম্পানগর শাস্ত্রীয় সংগীতের আরেকটি প্রধান কেন্দ্র। প্রিন্সলি স্টেট বানাইলির চম্পানগরের রাজকুমার শ্যামানন্দ সিনহা ছিলেন সংগীতের বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও ছিলেন তাঁর সময়ে বিহারের শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম সেরা গায়ক। কেশরবাঈ কেরকরের মত মহান শিল্পীরা শ্যামানন্দের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কুমারসাহেবের বন্দিশ শুনে পণ্ডিত যশরাজ অশ্রুপাত করে বলেছিলেন, 'আহা! তাঁর কেন এমন সামর্থ্য হয় না?'

ব্রিটিশ অপশাসনে বিহারের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে অনেক বিহারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফিজি ও মরিশাসে শ্রমিকের কাজ করার জন্য যায়। এসময়ে 'বিরহা' নামে পরিচিত তাদের বিয়োগান্তক নাটক ও গান ভোজপুর অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্য একে ভোজপুরি বিরহাও বলা। এসব বিষয়বস্তুর ওপর রচিত নাটক বিহারের নাট্যজগতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

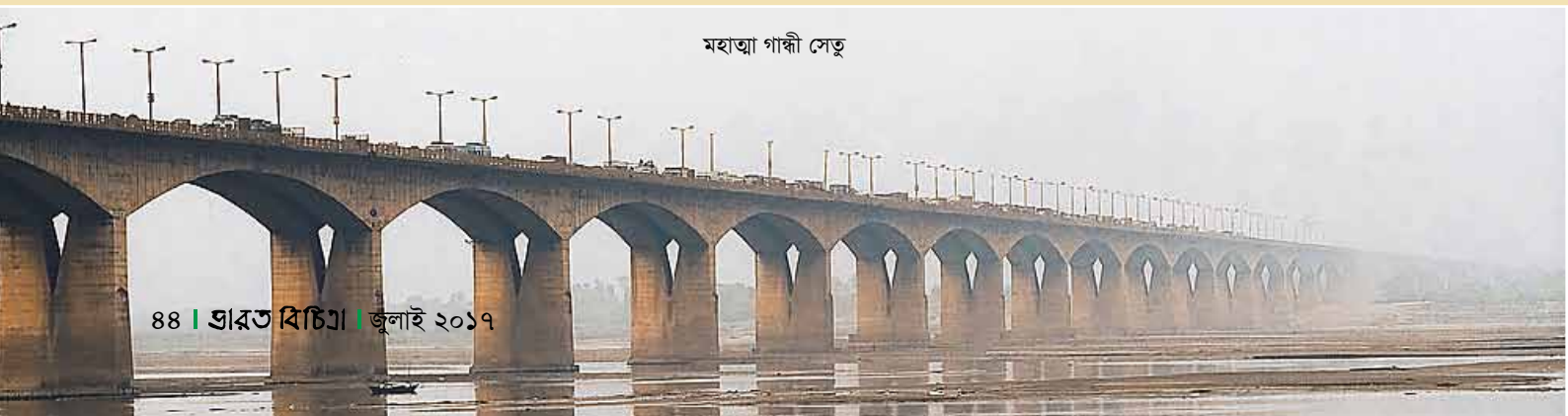

মহাত্মা গান্ধী সেতু

বিহারের রান্না

বিহারি রান্না বিহারের লোকজন যে-সব জায়গায় আছে যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ, নেপাল, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, পাকিস্তানের কয়েকটি শহর, গায়না, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, সুরিনাম, জ্যামাইকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে প্রচলিত। বিহারি রান্না ভোজপুরী, মৈথিলি ও মগহি রান্নার সম্মিলন। এই খাবার প্রধানত নিরামিষ, কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী– কাজেই নিরামিষই তাঁদের প্রধান আহার। তবে সোন, গন্ধক, গঙ্গা ও কোশি নদীর কারণে মিথিলার সাধারণ মানুষ মাছ-মাংস খেতে অভ্যস্ত। মুরগি ও খাসি-সহযোগে প্রস্তুত বিহারি মাংসের থালিও সর্বত্র পাওয়া যায়। দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দই, ঘি, মাখন, লাচ্ছি বিহারে খুব চলে। বিহারের রান্নার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় রান্নার খুব মিল যেমন আছে, তেমনি পূর্ব ভারতীয় অর্থাৎ বাঙালি খাবারেরও মিল আছে। অনেক পানীয় খুবই ঋতুভিত্তিক, যেমন তরমুজ ও বেলের পানা গ্রীষ্মে এবং তিলের খাজা, পোস্তদানার বিভিন্ন শুকনো খাবার শীতকালে খুব চলে।

বিহারি কাবাব, বিহারি বোটি, বিহারি চিকেন মসালা, ছাতু পরাটা, চোখা, মাছের ঝোল এবং পোস্তদানার হালুয়া খুব জনপ্রিয়।

বিহারি থালি

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ৩-৪ মাস অন্তর অন্তর বিহারি থালির খাদ্য-উপাদানে পরিবর্তন আসে। তবে ভাত, রুটি, আচার, চাটনি, ডাল ও দুগ্ধজাত খাবার অপরিবর্তিত থাকে।

কয়েকটি সবজিতে সয়াবিন বা সরিষার তেল এবং জিরা বা পাঁচ ফোড়নের ব্যবহৃত হয়। বিহারি খাবারে অনেক হাল্কা ভাজা খাবার থাকে, যাকে স্থানীয়ভাবে ভুঞ্জা বলে।

এই রান্নার বিশেষত্ব হচ্ছে 'ধোয়া ওঠা খাবার'। চোখা (আলু ভর্তা)-য় শুকনো লংকা ভাজা বিশেষ সুগন্ধ আনে।

ঐতিহ্যবাহী রান্না

কাড়ি-বড়ি: বেসন ও দইয়ে ডোবানো বেসনের তৈরি নরম ভাজা খাদ্যবস্তু কাড়ি-বড়ি সাদাভাতের সঙ্গে খুব চলে।

খিচুড়ি: চাল, ডাল ও সবজির সংমিশ্রণ। ওপরে ঘি ছড়িয়ে দেওয়া।

ঘুগনি: আস্ত ছোলা সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেদ্ধ করে সব রকম গরম মসলার গুঁড়া দিয়ে ঘন করে রান্না করা হয়। এর সঙ্গে চানা ডালও মেশানো হয়।

পিঠা: চালের গুঁড়ো জলে রেখে রুটির মত বেলে গোল করে নোনতা বা মিষ্টি স্বাদের পিঠা তেলে বা আগুনে ভাজা হয়। এর ভেতরে চানা ডাল, পোস্ত দানা ও গুড়ের পুর থাকে। তারপর জল বা দুধে জ্বাল দেওয়া হয়।

চুর: চাল ভাঙিয়ে তার সঙ্গে দই, চিনি বা গুড় মিশিয়ে তৈরি করা হয়। শীতকালে বাদাম ও পেঁয়াজ-কাঁচামরিচ সহযোগে চুর মেতে দারুণ লাগে।

ছাতু: কলাইদানা গুঁড়ো জলে সেঁকে নিয়ে জাল বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হয়– দারুণ বলকারক খাবার।

ধুসকা: চালে গুঁড়োর সঙ্গে ঘি ও সামান্য লবণ দিয়ে ভাল করে ভাজা খাবার।

লিট্টি: কলাইদানা গুঁড়ো করে সেঁকে নিয়ে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা, লেবুর রস, ধনে পাতা মিশিয়ে আটার সঙ্গে মিশিয়ে কয়লার ওপর পোড়ানো বা তেলে ভাজা হয়। দই, ঘি, চোখা ও বেগুন ভর্তার সঙ্গে খেতে খুব সুস্বাদু।

আমিষ রান্না

বিভিন্ন ধরনের মুরগি, খাসি, পাখির মাংসের কাবাবের কথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়। সাধারণত খাসির মাংসের বিহারি কাবাব বা পরোটা রুটি সহযোগে খেতে খুব সুস্বাদু। চম্পারণে খাসির গ্রিল থালিকে বলে তাস। এখন ফাস্ট ফুডের দোকানে বিহারি কাবাব বিহারি কাবাব রোল হিসেবে বিক্রি হয়।

এছাড়া চিংড়ি ও মাটন বিরিয়ানি, শাহী জিদ্দা মসালাদার, জোর ওয়ালি মছলি, জিদ্দা বিরিয়ানি, বিহারি কাবাব, চিকেন তন্দুরি কলা মছলি সুস্বাদু পদ।

রুটি

পরোটা, আলু পরোটা, ছাতু পরোটা, পিঁয়াজ পরোটা, পোস্তদানার পরোটা, ডাল পুরি, মাখুনি, মাখুনি রুটি ও নান।

মুখোরোচক খাবার

চাট, গোলগাপ্পা, চাটনি, ঝাল মুড়ি, দই বড়া, পাকোড়া, তরুয়া, কচুরি ইত্যাদি।

মিষ্টি

বিহারের মিষ্টি ওড়িশা বা বাংলার মিষ্টির মত রসালো নয়, শুষ্ক।

খাজা: সিলাও, নালন্দা ও পিপরা, সুপালে বিখ্যাত খাজার সঙ্গে তুলনা বলে গ্রিক বাকলভের।

তিলকুট: (তিল বরফি) শীতকালে সুলভ চিনি মাখানো তিলের টেনিসবল আকৃতির তিলকুট গয়া জেলায় খুব জনপ্রিয়। •

প্রবন্ধ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য
যোগব্যায়ামেরই একটি রূপ

মহুয়া মুখোপাধ্যায়

দু' হাজার বছরেরও প্রাচীন ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য তথা নাট্যকলার উৎপত্তির সঙ্গে যোগেরও যে সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। নাট্যশাস্ত্রে কথিত আছে যে 'ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ' ব্রহ্মাকে বললেন– আমরা এমন একটি আনন্দদায়ক বস্তু চাই যা যুগপৎভাবে শ্রব্য ও দৃশ্য অর্থাৎ শোনাও যাবে-দেখাও যাবে। যেহেতু বেদচর্চা সবার জন্য নয়, তাই অপর একটি পঞ্চম বেদ তৈরি করুন যা সকলের উপযোগী

'এবমস্থিতি তানুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ ॥'

–ব্রহ্মা দেবতাদের তথাস্তু বলে দেবরাজকে বিদায় দিয়ে যোগস্থ (চিত্তবৃত্তিবিরোধ– পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র) হয়ে চতুর্বেদ স্মরণ করলেন। তিনি ভাবলেন– 'আমি ইতিহাস নিয়ে পঞ্চম নাট্যবেদ সৃষ্টি করব, যা ধর্ম, অর্থ ও যশলাভের উপায়, সদুপদেশ ও পরম্পরাগত নীতির সংগ্রহ থাকবে, যা ভবিষ্যতে মানুষের সকল কর্মে পথপ্রদর্শক হবে, যা সর্বশাস্ত্রের অর্থযুক্ত এবং যা হবে সকল শিল্পের প্রদর্শক। এইভাবে ব্রহ্মা যোগের দ্বারা সকল বেদ স্মরণপূর্বক চারবেদ থেকে নাট্যবেদ তৈরি করেছিলেন।

হৃদ্‌স্পন্দনের তালে-ছন্দে দেহে ওঠে তাল-ছন্দের হিল্লোল, জাগে নাচ। রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে এই সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃত্যের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন– 'মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেন-না তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী। আবার নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ সঞ্চালনের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ।' তিনি খুব সুন্দরভাবে নৃত্যের সংজ্ঞা স্থাপন করেছেন– 'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ।

এইভাবে ব্রহ্মা যোগের দ্বারা বেদ-উপবেদ থেকে নিবদ্ধ নাট্যবেদ তৈরি করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত দেবতারা যে একে গ্রহণ ও রক্ষা করতে সমর্থ নন, একে বুঝতে ও প্রয়োগ করতেও অক্ষম, তাঁরা নাট্যকর্মের যোগ্য নন, এটা বুঝে ব্রহ্মা ঋষিদেরকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যাঁরা বেদসমূহের রহস্য জানেন এবং যোগব্রতে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা নাট্যবেদ বুঝতে, রক্ষা ও প্রয়োগ করতে সক্ষম।

'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত 'যুজ্' ঋতু থেকে উদ্ভূত যার মানে যুক্ত করা বা সংযোগ সাধন করা। অর্থাৎ গ্রন্থিভুক্ত করা বা সমন্বয় সাধন করা। যোগ আমাদের তনু-মন-প্রাণকে অন্তহীন উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে। আন্তর্জাতিক যোগকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উপলব্ধি করা যায়–

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'...

ভাগবতগীতায় বর্ণিত আছে– 'সমত্বং যোগ উচ্যতে', অর্থাৎ দেহ-মন এবং প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যা নৃত্যকলায় একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। হৃদ্‌স্পন্দনের তালে-ছন্দে দেহে ওঠে তাল-ছন্দের হিল্লোল, জাগে নাচ। রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে এই সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃত্যের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন– 'মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেন-না তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী। আবার নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ সঞ্চালনের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ।' তিনি খুব সুন্দরভাবে নৃত্যের সংজ্ঞা স্থাপন করেছেন– 'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয়– সৃষ্টির অভিপ্রায় দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য' অর্থাৎ এই হল যোগ বা সমন্বয় সাধন তাল-ছন্দ-ভঙ্গি ও নান্দনিকতার সমযোগ।

গতি বা চলন বা চারী, এটি নৃত্যকলা এবং যোগ উভয় ক্ষেত্রেরই এক অপরিহার্য অঙ্গ। গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ পণ্ডিত শুভঙ্করের লেখা *সংগীত দামোদরে* কথিত আছে যে–

'তৈলাভ্যক্তেন গাত্রেণ লঘ্বাহারো জিতশ্রমঃ।'– গায়ে প্রথমে তৈল মর্দন করে, লঘু আহার অর্থাৎ অল্প খেয়ে জিতশ্রম (শ্রমকে জয় করতে হবে) হয়ে চার অভ্যাস করতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নৃত্যের দেবতা হিসেবে শিব বা নটরাজ তথা নর্তেশ্বর সুপরিচিত। শিবের তিনটি রূপ কল্পিত– মহাযোগী বা যোগশ্রেষ্ঠ, মহাজ্ঞানী বা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং সংগীতজ্ঞ। সদাশিব যোগের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে পার্বতীকে বলছেন–

'জ্ঞাননিষ্ঠো-বিরক্তোহপি ধর্মজ্ঞোহপি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনাযোগেন দেবোহপি ন মুক্তিং লভতে প্রিয়ে ॥' – যোগবীজ

– হে প্রিয়ে! জ্ঞানবান, সংসারবিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় কিন্তু কোন দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না। শিব যোগশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বেদব্যাসপুত্র শুকদেব পূর্বজন্মে গাছের উপর শাখা অন্তরালে থেকে শিবমুখনির্গত যোগউপদেশ শ্রবণ করায় পক্ষীযোনি থেকে উদ্ধার পেয়ে পরজন্মে পরমযোগী হয়েছিলেন। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। নৃত্যকলাও সেরূপ পরম জ্ঞান– সাহিত্য, ভাষা, গান, তাল, ছন্দ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ব্রহ্মজ্ঞান সমস্তর সারনির্যাস। এইখানেই যোগের শ্রেষ্ঠতা– নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠতা।

নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায় 'তাণ্ডব লক্ষণ' নামে পরিচিত। সেই অধ্যায়ে শিব তথা নটরাজের 'করণ' অর্থাৎ ১০৮টি নৃত্ত-একক বর্ণিত।

'হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ।'

– হস্ত-পদে সম্মিলিত যোগে করণ বা নৃত্তালঙ্কার সৃষ্টি হয়। করণ ১০৮ প্রকার। যোগ শব্দটি লক্ষ্যণীয়।

প্রচলিত মতানুসারে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষকালেই যোগের প্রচলন ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগ অতিমাত্রায় প্রচারিত হয়। যোগের সবচেয়ে বড় ফল হল সর্ববিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। এই দুঃখ নিরোধই বুদ্ধদেবের যাবতীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এই দুঃখ নিরোধই বুদ্ধদেবের যাবতীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এই দুঃখ নিরোধের আটটি বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি পথের আদর্শকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল–

জ্ঞান (প্রজ্ঞা), সদাচার (শীল) এবং যোগ (সমাধি)। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণ যোগের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত।

ভারতীয় ঋষিদের মতে মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটি দেহ বর্তমান– স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। সেই আনন্দময় কোষ হচ্ছে ব্রহ্মস্বরূপ। সব শিল্পের মূলসূত্র এক– 'ব্রহ্ম'কে পাইয়ে দেওয়া বা উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেওয়া। ব্রহ্ম হচ্ছেন আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ থেকেই নিরন্তর রসের উৎপত্তি। উপনিষদের ঋষিরা পরম পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন:

'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, নাট্যশাস্ত্রের মতে রস হচ্ছে আস্বাদন বা স্বাদগ্রহণ। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আত্মারূপ রস ও ভাবই স্বীকৃত। রসনিষ্পত্তি না হলে কোন শিল্প সৃষ্টিই শিল্প আখ্যা লাভ করতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, আমাদের সমুদয় দুঃখের কারণ পাঁচটি– অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এগুলি নিরোধ করতে না পারলে প্রকৃত আনন্দ বা শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলি সম্যকভাবে দূর করার সার্থক উপায় হচ্ছে যোগ। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাও হচ্ছে তাল-ছন্দ-দর্শন-নান্দনিকতার সম্মিলনে 'নৃত্যযোগ' এবং তা রসংপৃক্ত। স্থির চিত্ত না হলে রসনিষ্পত্তি অসম্ভব। এই স্থির সংযম চিত্তই হচ্ছে যোগ-এর এক অখণ্ড রূপ।

যোগ ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের সমতা

- যোগ ব্যায়ামে হস্তমুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় যেমন– পতাক, সংন্দশ, অঞ্জলি ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় এই হস্তমুদ্রার ব্যবহার অসংখ্য এবং তা গভীর সংযমের সঙ্গে অভ্যাস করতে হয় এবং নৃত্যের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

- যোগব্যায়ামে যা আসন নামে অভিহিত নৃত্যকলার ক্ষেত্রে তাকে স্থানক বলা যায়। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হল মাত্র–

(সংগীত দামোদর অনুযায়ী)

যোগ-আসন	নৃত্যস্থানক
পদ্মাসন	ব্রহ্মস্থানক
বজ্রাসন	বৃষভাসনম্
বৃক্ষাসন	ঊর্ধ্বাসনম্
দণ্ডাসন	সমপাদ

- করণ হিসেবে বলা যায়–

শলভাসন	শকটাস্যকরণ (নাট্যশাস্ত্র)

- যোগভ্যাস যেমন শুরু করা হয় প্রার্থনা দিয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যও তেমনি শুরু করা হয় বন্দনা বা প্রার্থনা দিয়ে।
- যোগাভ্যাসের সময় যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে, শাস্ত্রীয় নৃত্যের সময়ও তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। উভয়ক্ষেত্রেই একাগ্রতা প্রয়োজন।
- যোগাভ্যাসের সময় যেমন শরীরকে শক্ত রাখা উচিত না, শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রেও কোনও অবস্থাতেই শরীরকে শক্তভাবে ধরে রাখা উচিত নয়।
- যোগ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভারতীয় দর্শন নিঃসৃত। যোগের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে আসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। আসনের শ্রেণিবিন্যাস দুই ধরনের– ধ্যানমূলক এবং সাংস্কৃতিক। প্রতিটি আসন করার ক্ষেত্রে যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ভাবনা, অভ্যাস, সময়, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলির সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নৃত্যকলার উৎসই অহিংসা ও সত্য থেকে যা পতঞ্জলির যম সাধনায় বিবৃত। সত্য-সুন্দর-কল্যাণই হচ্ছে নৃত্যের আত্মাস্বরূপ।
- মনের তিনটি গুণ বিদ্যমান– ক. সাত্ত্বিক, খ. রাজসিক, গ. তামসিক। সাত্ত্বিক– সংযম, রাজসিক– কার্যতৎপরতা, তামসিক– জড়তা। কার্যতৎপরতা দ্বারা মনের জড়তা ঘুচে যায় এবং মনকে সাত্ত্বিক করে নিতে হয়। যোগ্যাভ্যাসের দ্বারা মন সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হয়। নৃত্যের অভিনয়ভেদও চার প্রকার– আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। এই অষ্ট সাত্ত্বিকভাব নৃত্যকলার এক অপরিহার্য অঙ্গ। মনকে সংযত করার জন্য প্রাণায়াম নিত্য করণীয়। শরীরের বায়ুর গতিকে নিরোধ করাই প্রাণায়াম–

  'ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মানোনাথস্তু মারুতঃ ॥' হটযোগপ্রদীপিকা ৯

  –সুতরাং শরীরস্থ প্রাণবায়ু প্রাণায়ামের দ্বারা স্থির হলে চিত্ত স্থির হবে। স্থির চিত্ত ব্যতীত ধ্যান অসম্ভব।

  একইভাবে স্থির চিত্ত ব্যতীত শাস্ত্রীয় নৃত্য অসম্ভব। অষ্ট সাত্ত্বিকভাব, স্থায়ীভাব মূর্ত হবে না, ভাব মূর্ত না হলে রসনিষ্পত্তি হবে না।

  'যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলংধিয়া।
  স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্ ॥

  – ভাগবত ১১/৯/২২

  –যদি কেউ স্নেহ, দ্বেষে অথবা ভয়েও জেনে শুনে একাগ্ররূপে নিজের মনকে কোথাও সুস্থিত করে তখন সে সেই বস্তুর স্বরূপ লাভ করে।
- মনের একাগ্রতা ছাড়া আসন সম্ভব নয়। মনের একাগ্রতা বিভিন্নভাবে আসতে পারে–

  ১. ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে।
  ২. সুমধুর সংগীতের (গীত + বাদ্য + নৃত্য) মাধ্যমে।
  ৩. ঊর্ধ্ববাহু হয়ে (গৌড়ীয় নৃত্যে ঊর্ধ্ববাহু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।

  এই একাগ্রতার জন্য যেমন যোগাসন প্রয়োজন। নৃত্যকলাতেও অঙ্গ-প্রতঙ্গ-উপাঙ্গ-এর সংযম প্রয়োজন। *সংগীত দামোদর* (ভারতীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ) অনুযায়ী অঙ্গ ৬ প্রকার, প্রত্যঙ্গ ৬ প্রকার, উপাঙ্গ ১০ প্রকার। সংযম, অভ্যাস ও একাগ্রতার মাধ্যমে এগুলি অর্জিত হয়।
- শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান– এই পাঁচ প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিয়ম। শাস্ত্রীয় নৃত্যে ঈশ্বর প্রাপ্তি অর্থাৎ বন্দনা-মাঙ্গলাচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাত্মা-পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। আর সেইটিই তো ঈশ্বরপ্রণিধান।

  'যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো মধ্যেকচিত্ততা।' –আদিত্যপুরাণ

  – যোগাভ্যাসের মাধ্যমে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগের মাধ্যমেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সুতরাং চিত্তস্থির করবার উপায় প্রাণসংরোধ। একই কথা নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পরমযোগী মহাদেব নিজমুখে বলেছেন–

  'যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি!' – যোগবীজ

  সেই যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব নৃত্যদেবতা-নটরাজ এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য মার্গের শেষ হচ্ছে অন্তর্দশা নৃত্য বা মোক্ষ নৃত্য। নৃত্যের মাধ্যমে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে– পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়।

যোগ কী?

'সর্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে' – যোগশাস্ত্র

অর্থাৎ যৎকালে মানুষ সবচিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁর মনের লয়াবস্থা যোগ বলে পরিচিত হয়।

'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।' –পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২

শাস্ত্রীয় নৃত্য হচ্ছে নিজেকে নিবেদন করা পরমেশ্বরের কাছে, সব চিন্তা দূর করে। প্রকৃত জ্ঞান যোগাভ্যাস বা নৃত্যকলা ছাড়া হয় না–

'মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥'

– জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫১

বেদ চতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে তার নবনীত বা ক্ষীরস্বরূপ সারভাগ যোগীরা পান করেছেন। ঠিক একইভাবে চারবেদের নির্যাস থেকে পঞ্চমবেদ নাট্যশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের প্রথমেই আছে ব্রহ্মার যোগদশা থেকে পঞ্চমবেদের উদ্ভব, যা নাট্যশাস্ত্র নামে পরিচিত। সেই নাট্যশাস্ত্রের মূল্য হিসেবে বলা আছে–

'মঙ্গলকর, ক্রীড়াপূর্ণ, ব্রহ্মার মুখোদ্ভুত অতি পবিত্র শুভ পাপনাশক এই শাস্ত্রের পাঠ যে সর্বদা শোনে এবং নাট্যপ্রয়োগ করে অর্থাৎ নৃত্য বা নাট্য করে ও নাট্যানুষ্ঠান দেখে, সে সেই মঙ্গলময় লক্ষ্যে পৌঁছবে যা একমাত্র বেদবিদ্যানিজ্ঞাত ব্যক্তি, যজ্ঞকারী ও দাতা লাভ করেন।' এখানেই যোগ এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের অদ্ভুত মেলবন্ধন দৃশ্যমান। তাই তো বাংলার কবি শিবের গান গেয়ে ওঠেন, শিল্পীরা নেচে বেড়ান– 'যোগাসনে মহাজ্ঞানী মগ্ন যোগীবর'।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্র চেয়ার অধ্যাপক

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার কর্মব্যস্ততা...

০১. ৯ জুন ২০১৭ রমজান মাসে ঢাকায় ঢাকাস্থ তামিল সমিতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ভারতীয় হাই কমিশনে ৮ম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ২০১৬ থেকে হাই কমিশনের এ উদ্যোগে ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রক্তদান করছেন

০২. ১৪ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার নতুনদিল্লির কত্থক কেন্দ্রের ছাত্রী প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহম্মেদের সাক্ষাৎ। প্রফেসর মুনমুন জুলাই থেকে বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনে কত্থক ক্লাস পরিচালনা করবেন

০৩. ১৪ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ও নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের দ্বিপক্ষীয় ও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা

১

২

৩

৪

৫

০৪.
১৩ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে হিন্দিতে স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী অঞ্জয়রঞ্জন দাস ও নার্গিস সুলতানাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

০৫.
২২ জুন ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকার ভারত ভবনে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও গৃহকর্মীদের তাদের কর্তব্যপালনে ধন্যবাদ এবং ঈদ মোবারাক জ্ঞাপন

০৬.
৩০ জুন ২০১৭ চ্যাঞ্চেরি কমপ্লেক্সে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমিশনার মিস এলিসন ব্লেকের সাক্ষাৎ। বৈঠকে ভারতীয় ও ব্রিটিশ হাই কমিশনের রাজনৈতিক কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন

৬

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra July 2017

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ যোজনা...

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka